আলোরপথ
৭ম সংখ্যা, ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ২০ রজব ১৪৪৫ হিজরী

জান্নাতের পথে নিবেদিত কাফেলা : আমাদের প্রিয় এমসিএ

ইসলামের সেবা, মজবুত কম্যুনিটি গঠন ও বিলেতে একটি কল্যাণকর শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা

আদল মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তি ও তাকওয়া অবলম্বনের সোপান

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ঈমান ও চরিত্রকে রক্ষার উপায়

শীতকাল বহুমুখী নেক আমলের সুবর্ণ সুযোগ

আলোরপথ

৭ম সংখ্যা, ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ২০ রজব ১৪৪৫ হিজরী

উপদেষ্টামণ্ডলী

ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ
ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
মোসলেহ ফারাদী
নূরুল মতিন চৌধুরী
মোসাদ্দেক আহমেদ
ড. দিলদার হোসেন চৌধুরী

সম্পাদক

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী

সৈয়দ তোফায়েল হোসেন
মোস্তাকিম প্রামানিক
আবু ইহসান
মুজাম্মেল হোসেন তুহিন
ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান
ব্যারিস্টার আবু বকর মোল্লা
ড. মুহাম্মদ এহসানুল হক

পাবলিকেশন্স সহযোগী

জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ইউসুফ ইসলাম
www.infocard.live/yousufislam

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী : ২০২৪

প্রকাশনায়

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

- **জান্নাতের পথে নিবেদিত কাফেলা : আমাদের প্রিয় এমসিএ** ০৪
  হামিদ হোসাইন আজাদ
- **ইসলামের সেবা, মজবুত কম্যুনিটি গঠন ও বিলেতে একটি কল্যাণকর শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা** ০৮
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
- **আদল মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তি ও তাকওয়া অবলম্বনের সোপান** -মোসলেহ ফারাদী ১১
- **শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ঈমান ও চরিত্রকে রক্ষার উপায়** ১৫
  নুরুল মতিন চৌধুরী
- **শীতকাল বহুমুখী নেক আমলের সুবর্ণ সুযোগ** ২০
  শায়খ আব্দুল কাইয়ুম
- **এক নিরব দাঈ ইলাল্লাহ আমাদের প্রিয় আসলাম ভাই** ২২
  মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান
- **সুহবার গুরুত্ব : নববী আদর্শ** ২৬
  আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
- **অব্যক্ত অনুভূতি** -শামীম বিন সাঈদী ৩৬
- **আমাদের অন্তর যেন মরে না যায়** ৩৮
  আলী আহমাদ মাবরুর
- **মিযান-১** মো. সারওয়ার কবির শামীম ৪১
- **মুসলমানদের সোনালী অতীত (২য় পর্ব)** ৪৪
  আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ
- **আমি মুসলিম হওয়ার পর আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন** -আলিয়া উম্মে রাইয়ান ৪৭
- **আমি দুটি বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছি** ৫৩
  মারাম ফারাজ
- **বিজ্ঞান ও কুরআনের মতে আকাশে ভাসমান উড়ন্ত গ্রহাণু কি পৃথিবীর সভ্যতার ধ্বংসের ইঙ্গিত দিচ্ছে** ৫৬
  আব্দুল মতিন
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৮

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। মস্তক অবনতচিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। যিনি আমাদেরকে 'আলোর পথ'-এর ৭ম সংখ্যা প্রকাশের সক্ষমতা দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ (সা.) প্রতি।

'আলোর পথ' ইউরোপের ভূমিতে ইসলামের আলোর মশাল প্রজ্জ্বালন করার মহান কাজকে এগিয়ে নেওয়ার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত নানা প্রজন্মের মুসলিমদের যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধিতে জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের অন্তরে ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রোথিত করার লক্ষ্য নিয়েই 'আলোর পথ' নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে।

বিগত বছরে ইউরোপজুড়ে সম্পন্ন হওয়া কর্মকান্ডের পর্যালোচনা এবং নতুন বছরের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় এই আলোচনাগুলো এমসিএ'র কাজকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে ইনশাআল্লাহ।

একইসাথে, নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ যথারীতি আলোর পথে স্থান পেয়েছে। বিশেষত মুসলামানদের প্রধান লড়াই যে খোদাদ্রোহী শয়তানের সাথে তার হাত থেকে ইমান ও আমল রক্ষার জন্য করণীয় সম্পর্কে একাধিক নিবন্ধে যথেষ্ঠ সাবলীল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। যাপিত জীবনে আদল ও এহসান চর্চার গুরুত্ব এবং সুহবা তথা সঙ্গ নির্বাচনে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুটো নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

এই সংখ্যায় আরেকটি আকর্ষণীয় সংযোজন হচ্ছে– বৃটেনে বসবাসরত একজন বোনের অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী হওয়ার অসাধারণ ঘটনা। সর্বোপরি আশা করা যায়, অতীতের ধারাবাহিকতায় 'আলোর পথ' এর ৭ম পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

বরাবরের মত যারা আলোর পথ প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে এই কাজের উছিলায় সম্মানিত করুন। আমিন।

জান্নাতের পথে নিবেদিত কাফেলা :

আমাদের প্রিয় এমসিএ

হামিদ হোসাইন আজাদ

মালিক তুমি জান্নাতে
তোমার পাশে আমায়
একটি ঘর বানিয়ে দিও।

এ গানটি আমার বড্ড প্রিয়। এ গান আমার মনের কথা বলে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। কেননা আমার জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া এ চূড়ান্ত ঠিকানাটিকে ঘিরে। জীবনের স্বপ্ন একটিই, জান্নাতের মালিক আল্লাহকে আমি কখনও নারাজ করবো না, আর বিনিময়ে তিনি আমাকে (আমার পরিবারসহ) জীবন যুদ্ধের চির সঙ্গী কাফেলার সাথী প্রিয় ভাই বোনদের নিয়ে জান্নাতে তাঁর প্রিয় বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

বুঝ শক্তি হওয়ার পর থেকে জীবনের প্রায় পাঁচ দশক ধরে এ স্বপ্ন লালন করে চলছি। এ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই জীবনের সকল ঘাত প্রতিঘাতকে হাসি মুখেবরণ করে নিচ্ছি। এ অনাবিল স্বপ্ন পূরণের জন্য আমার জীবন ঘনিষ্ট অনেক সাথীদের হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছি। সাথীদের হাসিমুখে শাহাদাতের নজরানা পেশ করতে দেখে বুঝেছি এ জান্নাতের দাম কত আর এর মজা কত মধুময়, যার সম্মোহনী শক্তি শুধু অমানবিক নির্যাতনে সবর অবলম্বনেই শক্তি যোগায় না বরং মৃত্যুকে জয় করার অপরাজেয় সাহস যোগায়। তাই দুনিয়ার আভিজাত্যের প্রাসাদ অথবা বিলাসিতাপূর্ণ বাহন কখনও আমাকে সম্মোহিত করেনি এবং করে না, আলহামদুলিল্লাহ। কেননা এ বাহন আমাকে আমার অভিষ্ট গন্তব্যে নেওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারেনা। জীবন চলার গতি পথে এমন সব বাহনেই আরোহনের চেষ্টা করেছি এবং করে যাচ্ছি যার গন্তব্য জান্নাত এবং যার উদ্দেশ্য, কর্মসূচি জান্নাতে পৌঁছার উপযোগী একদল লোক তৈরিতে নিবেদিত এবং গতি সম্পন্ন। মহান আল্লাহ জান্নাতগামী লোকদের কাজের গতি এবং বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত তার নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (সুরা সফ, ৬১ : ১০)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। (সুরা সফ, ৬১ : ১১)

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য জান্নাতেই উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (সুরা সফ, ৬১ : ১২)

۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (٣٣١)

“তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।” (সুরা আল ইমরান : ১৩৩)

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٣٧﴾

"আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর।'" (সুরা জুমার ৭৩)

মহান আল্লাহর উপরে বর্ণিত নির্দেশনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, জান্নাতের গন্তব্যে পৌঁছতে হলে ১. জান্নাতগামী একটি মানসম্পন্ন কাফেলার সাথে নিরবিচ্ছিন্ন সম্পৃক্ততা থাকতে হবে ২. কাফেলার কাণ্ডারি এবং সাথীদের আল্লাহর ভালবাসায় উজ্জীবিত মুত্তাকি অথ বা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

জান্নাতি কাফেলার কাম্য বৈশিষ্ট্য সমূহ

১. একটি জান্নাত প্রত্যাশী কাফেলার সকল কাজের উদ্দেশ্য তথা কেন্দ্র বিন্দু হতে হবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

২. এ কাফেলার প্রধান লক্ষ্য হবে মানবতার কল্যাণ সাধন ও আল্লাহর হুকুম ও আহকামের আলোকে এবং মহানবী (সা.) প্রদর্শিত পন্থায় একটি সৎ ও কল্যাণধর্মী সমাজ কায়েম করা।

৩. এ কাফেলার কর্মসূচি বা কর্মপন্থা হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধানের আলোকে প্রণিত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত কর্মপন্থা, যা সমাজে সত্যবাণী প্রচার ও প্রসার, সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে ন্যায় ও কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত করতে সহায়তা করবে।

৪. এ কাফেলার নীতি ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রণয়ন এ ব্যবস্থাপনায় দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তি সমান-ভাবে গুরুত্ব পাবে। কেননা দুনিয়া হচ্ছে চিরন্তন জীবন আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।

৫. এ কাফেলার নেতৃত্ব নির্বাচনে জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি সততা এবং পরকালীন জবাবদিহির অনুভূতিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

জান্নাতি কাফেলার সাফল্য নির্ভর করে তার সাথীদের ভূমিকা ও বৈশিষ্টের উপর। জান্নাতগামী সাথীদের কাম্য বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর বন্দেগীই হবে এ কাফেলার প্রতিটি সাথীর নৈমত্তিক জীবনাচার। দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা বসা অবস্থায়, শয়নে অথবা জাগরণে সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকবে। "আমরা মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে আমার ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।" (সুরা যারিয়াত, ৫৬)। মহান আল্লাহর এ বাণী তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব মুহূর্তে প্রতিফলিত হবে।

২. এ কাফেলার সাথীরা জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এবং সমাজের প্রতিটি স্থরে আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। তাদের মনমগজে মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ ঘোষিত এ অভিপ্রায়টি প্রতিনিয়ত অনুরণিত হয়, "আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছি।"- (সুরা বাকারা, ৩০)

৩. এ কাফেলার সাথীদের পুরো জীবনটা হবে ইখলাসের মূর্ত প্রতীক। কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশিকা তাঁদের জীবনের পরতে পরতে প্রতিফলিত হবে। "আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)।" (সুরা আল আনআম, ১৬২)

মূলতঃ আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই হবে তাদের জীবনের মিশন।

৪. তারা কখনো আত্মকেন্দ্রীক হবে না। ভ্রাতৃত্বের নেয়ামতে সঞ্জীবিত সংগঠন হবে তাদের জীবনের সত্যিকার বাহন এবং মানবতার কল্যাণ সাধন ও একটি কল্যাণময় সমাজ কায়েমের ভিশন তাদের চিন্তা ও মননে সদা জাগরুক থাকবে এবং তাদের জীবন যাত্রায় তা সদা প্রতিফলিত হবে। আল্লাহ প্রদত্ত নিম্নোক্ত নির্দেশকা হবে তাঁদের জীবনের গতি নির্ধারক, "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।" (আল-ইমরান, ১১০)

৫. উত্তম এবং চুম্বকীয় চরিত্রই হবে তাদের প্রধান শক্তি। তারা কথায় নয় কাজে বড়ো হবে।

৬. ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা হবে তাঁদের সঞ্জীবনী শক্তি, মানবতার কল্যাণেই তারা পাবে শান্তি এবং স্বস্তি। সমাজের কোনো ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে কখনও অকল্যাণের আশঙ্কা করবে না।

৭. তাঁরা হবে পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক, আর হতাশ্বাস নিষ্পেষিত মানুষের মনের আকাশে আশার ধ্রুবজ্যোতি।

মূলত: জান্নাতই হবে এ কাফেলার মূল ঠিকানা। চরিত্রে এবং কর্মে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে জান্নাতের অভিযাত্রী হিসেবে এ কাফেলার সাথীরা ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির ফল্গুধারা প্রবাহিত করবে।

“

আমাদের এমসিএ, জান্নাতে যাওয়ার একটি বাহন। ইখলাস আমাদের চালিকা শক্তি, ভ্রাতৃত্ব আমাদের চালক

“

এম সি এ কী আমাদের জান্নাতের বাহন?

উপরে বর্ণিত জান্নাতি কাফেলার বৈশিষ্টগুলোর কষ্টি পাথরে মুসলিম কম্যুনিটি এসোসিয়েশন (এম.সি.এ)র ভিশন, মিশন এবং কর্মসূচিকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে এমসিএ একটি জান্নাতের পথে নিবেদিত কাফেলা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই এমসিএ'র সকল কাজের মূল উদ্দেশ্য বা মিশন। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত বিধান অনুসারে একটি কল্যাণ মূলক সমাজ প্রতিষ্ঠাই এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য বা ভিশন।

মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান, সংগঠিত জীবন যাপন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, সমাজকল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং ন্যায় ও সুবিচারের পক্ষে জনমত গঠন-এ পাঁচ দফা কর্মসূচি নিয়েই এমসিএ একদল জান্নাতি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত মানুষ তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

একটি গতিতশীল জান্নাতি কাফেলা হিসেবে এমসিএ প্রতিনিয়তই তার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতি সেশনে তাঁর যাত্রাপথের নতুন মাইল ফলক তথা goals নির্ধারণ করে থাকে এবং সে গোল বা টার্গেটে পৌছার নিমিত্তে motto এবং কর্মনীতি বা principles নির্ধারণ করে থাকে, যা এমসিএকে তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য পানে অবিচল থাকতে সাহায্য করে।

২০২৩-২৫ সেশনের জন্য এমসিএ তার পথ চলার guide হিসেবে নিম্নোক্ত motto নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

আমাদের এমসিএ, জান্নাতে যাওয়ার একটি বাহন।
ইখলাস আমাদের চালিকা শক্তি,
ভ্রাতৃত্ব আমাদের চালক

এ motto বা মৌলনীতির আলোকে গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত A to F of Working principles বা কর্মনীতির ভিত্তিতে এ সেশনের কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমসিএ।

A. Accountability তথা জবাবদিহি :

এমসিএ'র সর্বস্থরের নেতা ও কর্মীগণ নিম্নোক্ত চার লেভেলের জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে কাজ করবেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এ অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করবেন।

ক. আল্লাহর কাছে জবাবদিহি।
খ. দায়িত্বশীল তথা নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি।
গ. সহযোগী বা কর্মীবাহিনীর কাছে জবাবদিহি।
ঘ. নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি।

এ জবাবদিহি স্পিরিট রক্ষায় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সুরা ইনফিতার এবং সুরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ অনুকরণ করবেন।

B. Brotherhood তথা ভ্রাতৃত্ব :

এমসিএ'র সর্বস্থরের নেতা ও কর্মীগণ ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার ভিত্তিতে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক গঠন ও পরিচালনা করবে। ভ্রাতৃত্বকে

তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত একটি অত্যন্ত দামি নিয়ামত হিসেবে ব্যবহার করে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথকে সুগম করবে। তাঁরা সবসময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিম্নোক্ত হেদায়েতকে স্মরন রেখে পথ চলবে।

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।" (আল ইমরান, ১০৩)

"মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও।" (সুরা হুজরাত, ১০)

C. Communication and Consolidation তথা নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন :

কেন্দ্র থেকে ইউনিট লেভেল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও অতীতের অর্জনগুলোর সুসমন্বিত ভাবে একত্রীকরণের মাধ্যমে এমসিএ'র সর্বস্থরের সংগঠনকে আধুনিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় উপযোগী করে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হবে আমাদের কর্ম তৎপরতার একটি অন্যতম নীতি। ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহ সংশয়ের সকল পথ রুদ্ধ করে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচর্যার মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য। এ জন্য এ সেশনে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও মানউন্নয়নের প্রতি এমসিএ'র সর্বস্তরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সর্বদা যত্নবান থাকতে হবে। সাংগঠনিক পরিবেশে এবং সামাজিক জীবনে অর্থহীন কথাবার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

D. Dynamism তথা গতিশীলতা :

এমসিএ'র সর্বস্থরে গতিশীলতা বজায় রাখা এ সেশনে কাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মহান আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও সুরক্ষার জন্য ইবাদাতের সকল কাজে গতিশীলতা অর্জন অনিবার্য। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত মধ্যমপন্থী তথা (সুরা বাকারা, ১৪৩) নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে নেতৃত্ব তৈরি ও সংগঠন বিস্তৃতির ক্ষেত্রে একটি সাবলীল গতিশীলতা রক্ষার মাধ্যমে এমসিএ'কে একটি জান্নাতগামী দ্রুতযান হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই সংগঠনের সকল কার্যক্রমে এ নীতি বাস্তবায়নে সর্বস্থরের নেতা কর্মীদের এ নীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও তদারকি করণ এমসিএ'র কাজের একটি অবিচ্ছেদ অঙ্গ।

E. Empowerment তথা ক্ষমতায়ন বা বিকেন্দ্রীকরণ :

সুসমন্বিত ট্রেনিং, মনিটরিং, কর্ম বণ্টন ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করার মাধ্যমে এমসিএ'র সর্বস্থরে জনশক্তির মধ্যে সামাজিক নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা এ সেশনে সংগঠনের একটি অন্যতম কর্মনীতি। এ কর্মনীতির অংশ হিসেবে "তাকওয়াই মর্যাদার প্রতীক" এ সূত্রকে সমুন্নত রেখে দায়িত্ব পালনে প্রতিযোগীতার পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে সর্বস্থরে chain of leadership তৈরিই এ নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য সেশনের শুরু থেকে কেন্দ্রীয় বিভাগ এবং অঞ্চল সমূহে অধিকতর দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে বিভাগ ও অঞ্চলসমূহকে দায়িত্ব পালনে অধিকতর সক্ষমতা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

F. Family and Youth তথা পরিবার ও তরুণ প্রজন্ম :

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর" (সুরা আত তাহরিম, ৬), কুরআনের এ আহ্বানের ভিত্তিতে আপন পরিবার ও সন্তান সন্ততিদের জান্নাতের পথে আনার প্রতি এমসিএ যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের সিদ্বান্ত নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে পরিবার ও ছেলে সন্তানদের সংগঠনে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দাওয়াহ আদদ্বীনের কাজে নিয়োজিত করাকে সংগঠনের কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহর হুকুম পালনের পথকে সুগম করেছে।

অতএব আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, নীতি, কর্মসূচি এবং কর্মপদ্ধতি সকল বিবেচনায় এমসিএ জান্নাতের পথে ধাবমান একটি কাফেলা। সৎ ও ইতিবাচক মন ও নিয়ত নিয়ে যে কেউ এ কাফেলার শরীক হলে দিনের পর দিন তাঁর ঈমান মজবুত হবে, মন ও মনন ভ্রাতৃত্ব এ ভালবাসায় সিক্ত হবে, আচার আচরণ সম্মান ও মর্যাদায় পূর্ণ হবে, পারস্পরিক আস্থা মনকে প্রশান্তিতে ভরে দেবে। এ সংগঠনের যে দিকে যাবে সেদিকেই গতিশীলতা ও প্রেরণার ছোঁয়া অনুভব করবে। তবে এ কাফেলার সাথীদের কখনো একথা ভুলে গেলে চলবে না যে "মানুষের (ভাল) কাজের তৎপরতা যত বৃদ্ধি পাবে এবং যত গুরুত্ব অর্জন করতে থাকবে শয়তানের তৎপরতাও তত বাড়তেই থাকবে।" শয়তান আরও চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে তাদের সামনে থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাম দিক থেকে উপস্থিত হব। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।' (সুরা আরাফ, ১৪)

তাই এ জান্নাতি কাফেলার প্রতিটি সাথীকে শয়তানের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, তাঁর রকমারি কূটকৌশল সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। তবেই এ কাফেলার সাথী হয়ে জান্নাত অবদি পৌঁছা যাবে ইনশাল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমিন

লেখক: কেন্দ্রীয় সভাপতি: মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

ইসলামের সেবা, মজবুত কম্যুনিটি গঠন ও বিলেতে একটি কল্যাণকর শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা

(যেভাবে বৃটেনের জন্য একটি ইতিবাচক প্ল্যাটফরম হয়ে ওঠা যায়)

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

১. বৃটেনের সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

'যে ভূখণ্ডে আমরা আমাদের বসত গড়েছি সেখানে ইসলামের খেদমত কীভাবে পালন করা যায়' প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে এবং কর্মকাণ্ডে সেই প্রশ্নের প্রতিফলন থাকা উচিত। ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে বৃটেন বাংলাদেশকে ১৯০ বছর শাসন করেছে। বিনিময়ে রেখে গেছে বিভাজিত ভূখণ্ড আর ক্রীতদাসসুলভ মানসিকতা। ঔপনিবেশিক ইউরোপ গোটা মুসলিম বিশ্বকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে গেছে। তাই বৃটেনের ব্যাপারে আমাদের বাড়তি কিছু দায়বদ্ধতাও রয়েছে। দুঃখজনক হলো, আমরা স্থবিরতার মধ্যে থাকতে থাকতে ক্রমাগত হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়ছি। এর মূল কারণ হলো, আমরা ইসলামের মূল চেতনা ও শিক্ষাগুলো হারিয়ে ফেলেছি, বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তায় আক্রান্ত হয়েছি। একইসাথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভাবও এ জন্য দায়ী। অন্যদিকে, গত শতাব্দীতে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছিল তা গতি ধরে রাখতে পারেনি এবং কোনো স্থানেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।

ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৮০'র দশকে। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষ্য ছিল প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবীদের নিয়ে কাজ করা যাতে বুদ্ধিবৃত্তিক খাতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়। তবে, এই ফোরামটি জনশক্তির ধর্মীয় চাহিদা তৎপর হয়। তবে, বৃটিশ বাংলাদেশীদের (জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলার, ধর্মচর্চায় নিয়মিত নয় এমন মুসলিম) কাছেও এ ফোরামটি সেভাবে পৌঁছাতে পারেনি। এখনও বাংলাদেশী মুসলিমরা বৃটেনের মূলধারার সমাজ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এর কারণ হলো সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা। এমনকি অনেকক্ষেত্রে প্রবাসী মুসলিম সংগঠনগুলো নিজেদের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সন্তানদেরও এসব ফোরামের আওতায় নিয়ে আসতে পারেনি। ফোরামের বাইরে থাকা বৃহত্তর সমাজে সামাজিক ও মিডিয়া উদ্ভূত নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য এখন বড়ো ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে নাগরিক পর্যায়ে আরও বেশি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুসলিম সংগঠনগুলো সেই প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। সার্বিকভাবে, ইসলামফোবিয়াসহ বৃটিশ সমাজের নানা ধরনের বিপজ্জনক অসুস্থতাগুলো মোকাবেলা করতেও মুসলিমরা ব্যর্থ হচ্ছে। এ সব সংকট সমাধানের জন্য চাই নির্মোহ চিন্তা ও গভীর বিশ্লেষণ। মুসলিম সংগঠনগুলোকে তাদের কৌশল, কাঠামো, কাজের ধরনগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ এগুলো প্রণীত হয়েছিল কয়েক দশক আগে ভিন্ন এক সময়ে, ভিন্ন এক বাস্তবতায়। বর্তমানে বৃটেনে মুসলিমদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু মূলধারার সমাজ কাঠামোতে সামাজিক-রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব বিস্তারে তাদের অবস্থান খুবই নাজুক।

২. বৃটিশ বাংলাদেশী সম্প্রদায়

বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের মুসলিমরা বৃটেনের নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সংকটের ভেতর দিয়ে দরিদ্র শহুরে এলাকায় বসবাস

করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষার মান অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু এরপরও আমাদের সার্বিক অবস্থান ও মর্যাদা খুব একটা বাড়েনি। এখনো অবধি এই কম্যুনিটিকে অবজ্ঞার সাথেই বিবেচনা করা হয়।

অধিকাংশ বৃটিশ বাংলাদেশী– তারা সেক্যুলার হোক, ইসলামপন্থী হোক বা বামপন্থী; এখনো পর্যন্ত অনুভূতি ও সংস্কৃতির জায়গা থেকে বাংলাদেশকে প্রচণ্ডভাবে ধারণ করে যাচ্ছেন। বাঙালি মুসলিমদের এ চরিত্র সবখানে প্রায় একইরকম। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে বাংলাদেশীরা বেশ কিছু ইতিবাচক গুণাবলির জন্য পরিচিত যেমন পারিবারিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহানুভূতি, আতিথেয়তা এবং সরলতা। কিন্তু একইসঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু বাজে অভ্যাস এবং সামাজিক কিছু দুর্বলতার জন্যও তাদের দুর্নাম আছে, যেমন– নৈমিত্তিক অবস্থান, ক্ষণস্থায়ী মানসিকতা, সময়ের মূল্য দিতে না পারা, আড্ডাবাজি করা, হিংসা করা প্রভৃতি। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আমাদের কম্যুনিটির অনেকেরই ইসলাম ও সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে জ্ঞান খুবই সীমিত। এই সীমাবদ্ধতা তাদের ধর্মীয় আচারাদির মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয়। আমরা এখন এমন এক বিশ্বে অবস্থান করছি, যেখানে পরাশক্তিগুলো ন্যূনতম নৈতিক মূল্যবোধও চর্চা করছে না। এ বাস্তবতায়, বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশী মুসলিমদের উচিত দ্বীন ও দুনিয়া– উভয় জ্ঞানেই সমৃদ্ধ হওয়া এবং একইসাথে ব্যক্তিগতভাবে কিছু পরিকল্পনা ও কৌশল নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাতে করে তারা নিজেদের কম্যুনিটির বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

৩. স্থিতাবস্থা নাকি নবায়ণ

সংখ্যালঘু মুসলিম জনপদে যে মুসলিম সংগঠনগুলো কাজ করবে তাদের জন্য উম্মাহ (মুসলিম ভাই-বোন) এবং কওমের (যে কোনো নারী পুরুষ) প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। এই উপলব্ধি ছাড়া তাদের কার্যক্রমের প্রভাব খুব কমই দৃশ্যমান হবে। যুক্তরাজ্যে একটি কার্যকর সংগঠন হয়ে উঠতে গেলে মুসলিম সংগঠনগুলোকে স্বল্পমেয়াদে, মধ্যমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রাসঙ্গিক ও দূরদর্শী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাদের সাংগঠনিক কাঠামো হতে হবে সরল এবং একইসঙ্গে সবাইকে স্বাগত জানানোর মতো দৃষ্টিভঙ্গিও থাকতে হবে।

মুসলিম সংগঠনগুলোর দায়িত্বশীলদের উচিত নিজেদেরকেই নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করা:

- বৃটিশ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর কত শতাংশ নিয়ে তারা কাজ করছেন?
- আগামী এক দশকে তারা যুক্তরাজ্য থেকে কী অর্জন করতে চান?
- বিদ্যমান কর্মীবাহিনী, কার্যালয়, প্রকল্পের মাধ্যমে তারা সমাজকে কী দিতে চান?
- কীভাবে এ সংগঠনগুলো থেকে কেবলমাত্র সাংগঠনিক নয় বরং সামাজিক, সুশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বশীলও তৈরি করা সম্ভব হবে?

যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের টিকে থাকার জন্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখা এবং সমাজের মূলধারার মানুষগুলোর সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম সংগঠনগুলোর উচিত নিজেদের সম্বন্ধে এবং নিজেদের জনশক্তি ও কর্মীবাহিনীর ব্যাপারে নির্মোহ পর্যালোচনা করা। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আমাদের পরামর্শ হলো, মুসলিম সংগঠনগুলোকে সমানুপাতিক গুরুত্ব দিয়ে দুটো সেকশন বা অঙ্গ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এগুলো হলো:

ক) বাংলাদেশী সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন (বাংলাদেশী কমুনিটি সেকশন, BCS)

খ) বৃহত্তর সমাজভিত্তিক সেকশন (দ্য ওয়াইডার সোসাইটি সেকশন, WSS)

এ দুটো সেকশন নিয়ে কাজ করাই এ মুহূর্তে এবং আরও কিছু সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ দুটো কাজ হতে হবে গোছালো পন্থায় এবং পারস্পরিক নির্ভরশীল হিসেবে। এগুলোতে যারা কাজ করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। কোনো ধরনের চাপ দিয়ে কাজ করানো ঠিক হবে না। কর্মীদের ভাষাগত দক্ষতা এক্ষেত্রে সহায়ক হবে তবে এটিকেই একমাত্র মানদণ্ড বানিয়ে ফেলা উচিত নয়। কেউ হয়তো একটি সেকশনে কাজ করছে, কিন্তু তার যদি অপর সেকশনে কাজ করার আগ্রহ থাকে, সেই ধরনের জনসম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকে, সামাজিক দক্ষতা থাকে তাহলে তাকে পছন্দসই সেকশনে কাজ করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

যারা বিসিএস সেকশনে থাকবেন তাদের উচিত কম্যুনিটির প্রথম প্রজন্মকে সহায়তা করা যাতে তারা ইসলাহ'র (নিয়মিত উন্নতি) মাধ্যমে আরও উন্নত ইলম অর্জন করে ইসলাম অনুশীলন করতে পারেন, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগ্যতা যেন বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন প্যারেন্টিং, শারীরিক ফিটনেস এবং বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার মতো ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সম্পৃক্ত হন। অন্যদিকে, ডব্লিউএসএস কাজ করবে বৃহত্তর সমাজের ইতিবাচক মানসিকতার লোকদের নিয়ে, বিশেষ করে যারা সমতা, ন্যায়বিচার, ন্যায়নিষ্ঠ মিডিয়া এবং রাজনীতি, নীতি নির্ধারণী মহল এবং মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করছেন তাদের সাথে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি সেকশনেই হয়তো এমনও কিছু সদস্য/সদস্যা থাকবেন যারা দুটো সেকশনেই ভূমিকা রাখতে পারবেন, তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়াও যেতে পারে যদি তাদের তেমন আগ্রহ ও সক্ষমতা থাকে।

মুসলিম সংগঠনগুলোর উচিত উপরিউক্ত দুটো সেকশনের প্রয়োজন

ও চাহিদার আলোকে তাদের জনশক্তিকে উৎসাহিত করা এবং সার্বিকভাবে গোটা বাংলাদেশ/মুসলিম কম্যুনিটিকেই শক্তিশালী করা যাতে তারা যুক্তরাজ্যে একটি কল্যাণকর ও ইতিবাচক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বিশুদ্ধ নিয়তে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড এবং সৃজনশীল কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪. কোন ধরনের মানুষ প্রয়োজন

নীতিহীন এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা সম্পন্ন নেতাদের মাধ্যমে পরিচালিত পশ্চিমা একটি দেশে মুসলিম সংগঠনগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত– এমন ধরনের জনশক্তি তৈরি করা যারা সামাজিকভাবে হবেন যোগ্য, জনগণের সাথে সম্পৃক্ত, আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, উন্নত জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং কর্মমুখী। এ ধরনের যোগ্য ও ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষেরাই অমুসলিম অধ্যুষিত সমাজের সকল অংশীদারদের সাথে মিলে কাজ করতে পারে এবং রাজনৈতিক ও মিডিয়ার ময়দানে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোকেও বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং শালীনভাবে মোকাবেলা করতে পারে। যে জনশক্তি কেবল নিজেদের নিয়েই এবং নিজেদের সাথেই কথা বলে, যারা খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করে তারা এত বড়ো সব কাজ করতে পারে না। যদি সৎ এবং যোগ্য মানুষগুলো সামাজিক জীবন থেকে দূরে থাকে কিংবা ইসলামবিরোধী একটি সমাজে থাকার কারণে সবসময় নানাবিধ আশঙ্কা ও ভয়ে জর্জরিত থাকে তাহলে তারা কীভাবে ঐ সমাজে ভূমিকা রাখবে? আর তেমনটা হলে তারা আল্লাহর কাছেই বা কী জবাব দেবেন? এক্ষেত্রে কাজ শুরু করার প্রথম ধাপটাই হলো আরও বেশি সামাজিক হওয়া, বহির্মুখী হওয়া, মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের (গঈই) মতো সমমনা মুসলিম সংগঠন কিংবা মুসলমানদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সুশীল সংগঠন সিটিজেন ইউকের (ঈরঃবুবহ টক) মতো ফোরামগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা। তাহলে বৃহত্তর সমাজের জন্য কাজ করা অনেকক্ষেত্রেই সহজ হয়ে যাবে। মুসলিম সংগঠনের তারবিয়াহ বিভাগকে আরও বিস্তৃত হতে হবে এবং সমসাময়িক বৃটেন এবং বৃটেনের সমাজ কাঠামোর সাথে প্রাসঙ্গিক ইসলামী জ্ঞানকে অধিক উপস্থাপন করতে হবে। এমনটি করা সম্ভব হলে জনশক্তির মাঝে তাদের একাধিক পরিচয়সত্ত্বা বিশেষ করে নৃতাত্বিক, জাতীয়তা, ভাষাগত এবং বিশ্বাসগত পরিচয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

মুসলিম সংগঠনগুলোর সিলেবাসে জ্ঞান, কুরআন অধ্যয়ন, সুন্নাহ, সিরাত, ইতিহাস, ব্যক্তির চরিত্র গঠনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার উন্নয়ন যেমন অন্তর্ভুক্ত থাকবে তেমনি থাকবে বৈষয়িক বিষয়াবলী, চারপাশের সমাজ নিয়ে আলোচনা যাতে করে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো পেশাদারিত্বের সাথে মোকাবেলা করা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের প্রেক্ষাপটে যে বইগুলো রচিত হয়েছে সেগুলো অন্তর্নিহিত বা নেপথ্য জ্ঞানের অংশ হিসেবে জরুরি, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে বইগুলো লেখা হয়েছে তা অধ্যয়ন করা বৃটেনে বসবাসরত মানুষগুলোর জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নেতা ও কর্মী উভয়কেই নিজেদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য নানা ধরনের বই পাঠে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের আগ্রহ ও সক্ষমতার আলোকে বিশেষ কোনো বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করতে পারেন বা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠবেন। জনশক্তিদের পরিবারের সদস্যদের ভেতরও বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেখানে সম্ভব সেখানে উম্মুক্ত বই পাঠ ক্লাব বা পাঠচক্রও চালু করা যায়। সৃজনশীল মানসিকতা এবং উন্নত চরিত্র লালন করার মাধ্যমে আমাদের সবারই এখন থেকেই ইসলাম ও জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। এই অনুশীলনগুলো করা ছাড়া মুসলিমরা টিকেই থাকতে পারবে না, নব্য ঔপনিবেশিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তো দূরের কথা। মনকে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবমুক্ত রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য তখনই কাজে আসবে যখন এই আধিক্যকে যোগ্যতায় রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

৫. বৃটেনে কল্যাণকর একটি শক্তি হয়ে ওঠা

কুরআনের অসাধারণ আকর্ষণ ক্ষমতার কারণেই যুগে যুগে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ছুটে এসেছে। একইসঙ্গে, মুসলিমদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বিশেষ করে বিস্তৃত জ্ঞান, নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মার্জিত ব্যবহার এবং ইসলামের শিক্ষার আলোকে গড়ে ওঠা উন্নত চরিত্রের কারণেও মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বৃটেনে ঐতিহাসিক কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য এখানকার মুসলিম সংগঠনগুলো কি কার্যকর সংস্থা হয়ে উঠতে পারবে?

"উপরে থাকা হাতটি নিচে থাকা হাতের চেয়ে উত্তম। উপরের হাত হলো সেই হাত যা অপরকে দেয় আর নিচের হাত হলো সেই হাত যা কেবলই গ্রহণ করে যায়।" (বুখারি, মুসলিম)

লেখক: শিক্ষাবীদ, প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ,
সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল, মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন।

আদল মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তি ও তাকওয়া অবলম্বনের সোপান

মোসলেহ ফারাদী

এ নিবন্ধের সূচনা করতে চাই, পবিত্র কুরআনের সুরা আন নাহলের ৯০ নং আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে। যেখানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অন্যায্য কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।”

জুমার দিনের কোনো খুতবা এই আয়াতটি পাঠ না করে সম্পন্ন করা হয় না। খতিব সাহেব প্রতিটি জুমায় এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে আমাদেরকে এর নির্দেশনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন। এ চর্চা থেকে এই আয়াতের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা যায়। এই আয়াতে আদল ও ইহসান (ন্যায়পরায়ণতা এবং সদাচরণ) বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই পরিসরে আমরা আদলের ওপরই আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। ইহসান প্রসঙ্গটি আরও বিস্তৃত হওয়ায় পরবর্তীতে এই ইস্যুতে পৃথক কোনো আলোচনা উপস্থাপনা করার ইচ্ছাপোষণ করি, যদি আল্লাহ কবুল করেন।

কুরআনের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো একটি বিষয়ে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাত্র একবারও উল্লেখ করেন অর্থাৎ একবারের জন্যেও আদেশ দেন, তাহলেই তা আমাদের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামুলক হয়ে যায়। সেখানে আদল বা ন্যায্যতা বা ন্যায়পরায়ণতা হলো এমন একটি যে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা অনেকগুলো আয়াত নাজিল করেছেন। এমনটা খুব কম বিষয়ের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। আদলের বিষয়ে কুরআনে শুধু আয়াতই নয়, বরং বিস্তারিত আলোচনাও আছে। আল কুরআনের পাশাপাশি আদলের বিষয়ে রাসুল (সা.) এর হাদিস আছে, ফিকাহ শাস্ত্রেও অনেক আলোচনা আছে।

আদল হলো ইনসাফ। যার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছি। গোটা মানবকুল ইনসাফ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বারবার ন্যায়বিচার করার আদেশ দিয়েছেন। সুরা আস শুরার ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন,

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ١٥

“সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ রব ও তোমাদেরও রব। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তারই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।”

এই আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এই কিতাবের ওপর এবং এ কিতাবে বর্ণিত সব বক্তব্যের উপর ঈমান আনার উদ্দেশ্যই হলো ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম করা। এ কিতাব নাজিলই হয়েছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর প্রতি ইনসাফ, মানুষের প্রতি ইনসাফ, অন্য সব সৃষ্টিকুলের প্রতি ইনসাফ। ওহি নাজিল করার উদ্দেশ্যও ইনসাফ বিধান করা। আল কুরআনের সুরা আল আরাফের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ٢٩

“আপনি বলে দিন; আমার রব সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রতিটি সিজদার সময় নিজেদের মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে এবং ইখলাসের সাথে তাকে ডাকো। তোমাদের প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, আবারও একইভাবে তোমাদের সৃষ্টি করা হবে।

এই আয়াতে আল্লাহ দুটো নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে সুবিচারের নির্দেশ, দ্বিতীয় নির্দেশনাটি হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়। এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা হলো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হতে হবে ইখলাসের ভিত্তিতে, পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায়। আর এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ মানুষের সাথে সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। এই আয়াত অনুযায়ী, মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুবিচার বা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার হলো প্রাপ্য হকের ন্যূনতম পরিমাণ। আর প্রাপ্যের চেয়েও বেশি বা অতিরিক্ত দেওয়ার নাম হলো ইহসান।

আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রেরিত নবি-রাসুলগণকে শুধুমাত্র আদল করার জন্যই দুনিয়ায় পাঠাননি। বরং একই সাথে তাদেরকে নিদর্শনও দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা সুরা আল হাদিদের ২৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ٢٥

"আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাকে ও তার রাসুলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি নবি-রাসুলদের যেভাবে পাঠিয়েছেন, তাদের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার মূল্য উদ্দেশ্যই হলো, মানুষ যেনো ইনসাফ নিয়ে দণ্ডায়মান হয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইনসাফ কায়েম করে।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আমরা আদল বা ইনসাফের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমরা আগেই বলেছি, কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা এর প্রাসঙ্গিকতা বা বাস্তবিক প্রয়োগ নিয়ে একটু আলোচনা করবো। সুরা আল মায়েদার ৮ নং আয়াত আমাদের সবারই পরিচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর কেননা এটিই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে ভালোভাবেই জানেন।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন; কারণ আমরা অনেক সময় কোনো একজন ব্যক্তির সাথে হয়তো ন্যায়বিচার করি না, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে অবিচার করি কারণ তিনি আমাদের বন্ধু পর্যায়ের নয়, বরং শত্রু। হয়তো আমরা একজন মানুষকে কোনো কারণে কম পছন্দ করি; তাই যখনই তার বিষয়ে কোনো বিষয় আমাদের সামনে আসে, সেক্ষেত্রে তার অবস্থান যদি সঠিকও হয়, তারপরও আমরা নীরব থাকি। ন্যায়বিচার না করে সংযত থাকি। আল্লাহ তা'য়ালা এমনটা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ এ আয়াতে আরও জানিয়েছেন, ইনসাফ হলো তাকওয়ার নিকটবর্তী বিষয়। তাই কেউ যদি ন্যায়বিচার না করে তাহলে প্রকারান্তরে তিনি তাকওয়া থেকেই দূরে সরে যান। আর তাকওয়া থেকে দূরে যাওয়া মানেই আল্লাহ থেকে দূরে যাওয়া।

সুরা নিসার ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ٥٨

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে শুরু কর, তখন ন্যায়ের ভিত্তিতে মীমাংসা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন।"

এখানে আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্য করে হুকুম দিয়েছেন, যখন আমরা দুজন মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবো, তখন যেন আমরা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই মীমাংসা করার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা দরকার, মীমাংসার অর্থ কিন্তু ব্যাপক। শুধু সালিশ বিচারেই মীমাংসা হয় তা কিন্তু নয়। অনেক সময় আমরা অপরাপর মানুষ সম্বন্ধে মতামত দিয়ে দেই। কাউকে ভালো বলি, আবার কাউকে হয়তো খারাপ বলি। আবার এমনও হয়, আমরা হয়তো মুখে বলছি না। কিন্তু কারও সম্বন্ধে ধারণা করে নিচ্ছি। ফলে, একজন মানুষ সম্বন্ধে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণা আমাদের মাতায় অবচেতনভাবেই থাকে। এটিও কিন্তু এক ধরনের মতামত বা অবস্থান। তাই কারো ব্যাপারে মতামত দেওয়া, সিদ্ধান্ত দেওয়া কিংবা কারো বিষয়ে ধারণা করার ব্যাপারেও আমাদের সচেতন থাকা জরুরি যাতে আমরা তার প্রতি জুলুম না করি, বরং ইনসাফ করি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমরা অনেকেই এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই ইনসাফ করতে ব্যর্থ হই এবং তা হই নিজেদের স্বার্থচিন্তার কারণে।

রাসুল (সা.) এর সাহাবাগণ ইনসাফের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তারা অনেক বেশি সতর্ক থাকতেন, ভীত থাকতেন, যে আদৌ তারা ইনসাফ করতে সক্ষম হবেন কিনা। সুরা নিসার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ দুবার তাদের এই আশঙ্কা বা ভয়ের ব্যাপারটি উল্লেখ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟

অর্থাৎ "যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ভয় বা আশঙ্কা থাকে" আবার একই আয়াতেই আল্লাহ দ্বিতীয়বার আবারও বলেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟

“আর যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোনো আশঙ্কা থাকে যে তোমরা আদল বা ইনসাফ করতে পারবে না।” যে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতটি নাজিল করেছিলেন তা আমাদের নিবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। তারপরও এই আয়াতের দুটো অংশ উল্লেখ করা হলো শুধু এটুকু বোঝানোর জন্য যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বীকৃতি দিয়েছেন, সম্মানিত সাহাবাগণ আদল বা ইনসাফ করার বিষয়ে কতটুকু সতর্ক বা সাবধান থাকতেন। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٥١

“এতিমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তমপন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর।”

এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল তৎকালীন বাজার পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। তখন এমন একটি সময় ছিল, যেখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিক্রেতারা ক্রেতাকে পণ্য দেওয়ার সময় মাপে কম দিতো। আমাদের এ সময়ে এসেও মাপে কম দেওয়ার বিষয়টি অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। এমনকি যেসব কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান প্যাকেটজাত দ্রব্য বাজারে সরবরাহ করে তারাও অত্যন্ত কৌশলের সাথে ওজনে বা মাপে কম দিয়ে দেয়। দেখা গিয়েছে, ক্রেতা হয়তো ১ কেজি মনে করে পণ্য কিনেছে কিন্তু প্যাকেটে ৯০০ গ্রাম লিখেছে। ১ কেজি ও ৯০০ গ্রামের প্যাকেট পার্থক্য বুঝা সহজ নয়। দোকানদার তাকে চালাকি করে ১০০ গ্রাম প্রাপ্য পণ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। বাজারের বাইরে সাধারণভাবেও অনেকেই এ ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করে থাকেন। মানুষ সহজাতভাবেই নিজের প্রাপ্যটা পুরোপুরি এমনকি সম্ভব হলে প্রাপ্যের চেয়েও বেশি পরিমাণে নিতে চায় আর অপরকে দেওয়ার বেলায় কম করে দেয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এ বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, যদি দু'জন ব্যক্তি বা দুই পক্ষের মাঝে বিবাদ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রেও ন্যায়নিষ্ঠপন্থায় আমাদের মীমাংসা করার চেষ্টা করা উচিত। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩

“যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগপন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।”

এই আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যখন আমরা দুজন মানুষের মধ্যে বিতর্ক, ঝগড়া, মারামারি বা বিবাদ সুরাহা করবো তখনও যেন আমরা তা ইনসাফের সাথে এবং ন্যায়নিষ্ঠপন্থায় করার চেষ্টা করি। কারণ যারা ইনসাফ করে তাদেরকেই আল্লাহ ভালোবাসেন। অপরদিকে সুরা আন নাহলের ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন,

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٦٧

“আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির, একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের উপর বোঝা। যেদিকে তাকে পাঠায়, কোনো সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায় বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে।”

এখানে আল্লাহ দু'জন ব্যক্তির কথা বলেছেন। এর মধ্যে একজন বোবা। যাকে বলা যায় গুড ফর নাথিং। তার মনিবের জন্য সে একজন বোঝা, কারণ সে কোনো কাজেই আসে না। আল্লাহ প্রশ্ন তুলেছেন, এ ধরনের একজন অক্ষম ব্যক্তি কি কখনো ন্যায়বিচারকারী বা ইনসাফকারীর সমমানের হতে পারে? এখানে ইনসাফের কথাটি কেন আসলো তা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবেন না। অকর্মা কোনো ব্যক্তির সাথে ইনসাফকারী ব্যক্তির তুলনা করার মূল কারণই হলো, যিনি ইনসাফ করতে পারেন তিনি আসলে প্রোডাকটিভ বা কর্মমুখীও হন। তাই যদি কেউ সক্রিয় হতে চান, কর্মতৎপর একজন মানুষ হয়ে উঠতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই ইনসাফ করার ব্যাপারেও তৎপর হতে হবে। আর যিনি ইনসাফ করেন না, তিনি কোনো কাজ করার মতো যোগ্যও হয়ে উঠতে পারেন না।

রাসুল (সা.) বরাবরই উম্মাহকে আদল তথা ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। একটি হাদিসে আছে; রাসুল (সা.) বলেছেন, “তিন ধরনের মানুষের দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। রোজাদার ব্যক্তি যতক্ষণ তিনি রোজা ভঙ্গ করেন না। ন্যায়বিচারক শাসক এবং মজলুম মানুষ।”

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিসও উল্লেখ করা যায়;

“রাসুল (সা.) বলেছেন, তিন ধরনের বিচারক আছেন। এর মধ্যে একজন জান্নাতি আর দুজন জাহান্নামি। জান্নাতি হলেন তিনি যিনি সত্য জানেন এবং সেই আলোকেই বিচার করেন। আর দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামি। এদের একজন সত্য জানার পরও মিথ্যা রায় প্রদান করেন আর অপরজন সত্য না জেনেই রায় প্রদান করেন।” (আবু দাউদ ৩৫৭৩)

আপনি যা মনে করছেন তাই ন্যায়বিচার নয়। বরং ন্যায়বিচার হলো এমন একটি বিষয় যা তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অথচ আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময় প্রকৃত তথ্য ও ঘটনা না জেনেই অনেকের বিষয়ে মতামত দিয়ে দেই, সিদ্ধান্ত

নিয়ে ফেলি। আমাদের প্রিয় নবি (সা.) কঠোরভাবে আমাদেরকে এ ধরনের অনুশীলন থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা জরুরি। অভিজাত কারো জন্য আইনের জন্য ব্যত্যয় যেন না হয়। নিজের পরিচিত কারো বেলায় অন্যায্য ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। রাসুল (সা.) একটি হাদিসে বলেছেন, "আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করতো এবং তা প্রমাণিত হতো, আমি তার হাত দুটো কেটে ফেলতাম। মূল হাদিসটি এরকম; রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল– যাদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যখন তাদের অভিজাত ব্যক্তিরা অন্যায় করতো তখন তাকে ছেড়ে দিতো আর যদি দুর্বল কেউ অন্যায় করতো তাহলে তার ওপর শাস্তি আরোপ করতো। আল্লাহর কসম, যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও কখনো চুরি করে আমি তার হাত কেঁটে ফেলতাম।

আমরা আইনের ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন এই দৃষ্টিভঙ্গি অহরহই লালন করি। অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন, শুধুমাত্র এই অনাচারটি করার কারণে অতীতে একাধিক মানব সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

পরিশেষে এটুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, মুসলিম হিসেবে আমাদের দুই ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। একটি সম্পর্ক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে, আর অপরটি সাধারণভাবে সব মানুষের সাথে। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সম্পর্কটি পরিচালিত হতে হবে ইখলাসের ভিত্তিতে আর মানুষের সাথে সম্পর্কটি গড়তে হবে আদল ও ইনসাফের আলোকে। আদল মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক একটি অনুশীলন। যিনি যতবেশি আদলের চর্চা করতে পারবেন, তার তাকওয়া ততটাই সমৃদ্ধ হবে। অথচ আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পছন্দ-অপছন্দের কারণে আমরা আদল করা থেকে অনেক সময়ই বিরত থাকি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এখানে আলোচনায় করা দরকার। আমাদের নিজেদের প্রতি যখন কেউ কোনো অন্যায় করে, আমাদের প্রত্যাশার বাইরে কিছু করে, তখন আমরা তা জুলুম হিসেবে গণ্য করি। কিন্তু আমরা নিজেরা অপরের বেলায় জুলুম করছি কিনা তা নিয়ে আমরা মোটেও সচেতন নেই। আমাদের কথা বা কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেউ জুলুমের শিকার হচ্ছে কিনা তা নিয়েও আমরা সতর্ক নই। আমার ভাবনায়, কিংবা অন্য কারো ব্যাপারে মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা জুলুম করছি কিনা তা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন নই। অথচ এ সতর্কতাটুকু অবলম্বন করা অপরিহার্য।

এখানেই মানুষ হিসেবে আমাদের দুর্বলতা। তবে যারা রোল মডেল, যারা মানুষের জন্য আইকন, সেই সব কীর্তিমান মানুষেরা বরাবরই অপরের মাধ্যমে মজলুম হওয়ার তুলনায় নিজের করা জুলুম নিয়ে অধিক পেরেশান থাকেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, আদল হলো ন্যূনতম অধিকার। এটুকুও যদি আমরা করতে না পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা জুলুম করে ফেলবো। আর ইহসান হলো প্রাপ্যের চেয়েও কিছুটা বেশি দেওয়া যাতে সংশ্লিষ্ট প্রাপকের কল্যাণ হয়। উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের কথা বলা যায়। ধরা যাক, বাবা-মায়ের সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানেরা পাওয়ার পর শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী ভাই-বোনেরা সবাই নিজেদের অংশটুকু ভাগাভাগি করে নিলেন। এটি হলো আদল। আর বণ্টন সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোনো ভাই বলেন, "আমার অমুক বোনটি কিছুটা অনগ্রসর অবস্থায় আছে আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে যথেষ্ট ভালো অবস্থানে রেখেছেন। তাই আমার আমার পাওনা সম্পদ থেকে কিছু অংশ বিনা দাবিতে আমার বোনকে দিয়ে দিতে চাই।" তাহলে এটি হলো ঐ বোনের জন্য ভাইয়ের ইহসান।

আমরা যারা সাংগঠনিক পর্যায়ে কাজ করি, আমাদেরকে নিয়মিতভাবে সিদ্ধান্ত দিতে হয়, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে হয়। আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন যাতে করে আমরা কারো প্রতি জুলুম না করি। প্রতিটি সিদ্ধান্ত বা মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক স্বার্থকে যেন আমরা সবার ওপর অগ্রাধিকার দিতে পারি। এমনটি করতে গিয়ে কারো কারো স্বার্থহানি হতে পারে। তারপরও আমাদের সাংগঠনিক স্বার্থকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা যখন কাউকে নেতৃত্বে বা পরিচালনায় নিয়ে আসবো, অথবা আমাদের কেউ যখন এ ধরনের কঠিন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবো, তখন মনে রাখতে হবে, আমরা যেন ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। আমাদেরকে এমন ব্যক্তিদের সামনে নিয়ে আসতে হবে যারা অপরের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠতে পারেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সামনে মিজান বা দাঁড়িপাল্লার নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন। আমরা যেন তা বজায় রাখতে পারি।

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ খুবই ভালো। কিন্তু হয়তো একান্ত পারিবারিক জীবনে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রে তার মান ততটা উন্নত নয়। এমন ব্যক্তিরা নেতৃত্ব চলে আসলে সাধারণ কর্মীদের সামনে নেতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। আমাদেরকে এমন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে যার দুনিয়াবী পারদর্শিতা যেমন উত্তম, তেমনি তার তাকওয়া, মুআমেলাত এবং আমলী জিন্দেগীও একইসাথে উত্তম হবে। আর সর্বশেষ কথা হলো, আমাদেরকেই বারবার নিজেদের ইহতিসাব, আত্মসমালোচনা করতে হবে। আমরা যেন অন্য কারো ওপর জুলুম না করে বসি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে জীবনের সব ক্ষেত্রে আদল প্রতিষ্ঠা করার তাওফিক দিন। আমিন।

(প্রবন্ধটি জনাব মোসলেহ ফারাদীর একটি ইংরেজি আলোচনার বঙ্গানুবাদ। স্বাভাবিক কারণেই ভাষা ও আলোচনার গতি সংরক্ষণ কঠিন কাজ। আশাকরি পাঠক সেভাবেই এটিকে পড়বেন।)

লেখক: সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ঈমান ও চরিত্রকে রক্ষার উপায়

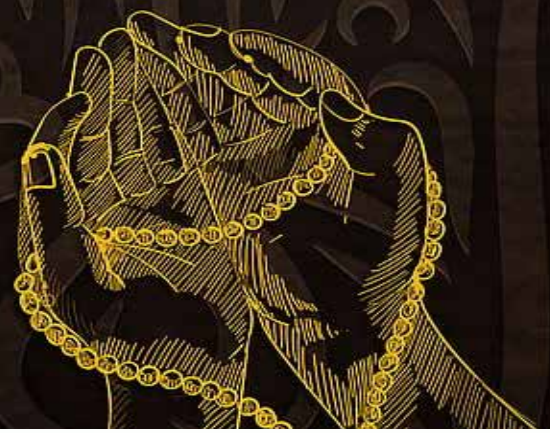

নুরুল মতিন চৌধুরী

শয়তান কীভাবে আমাদের হৃদয়কে কলুষিত করে এবং কীভাবে আমাদের ঈমান ও চরিত্রকে রক্ষা করতে পারি?

১. অভিশপ্ত শয়তানের পটভূমি

شَيْطَان একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ "যে অনেক দূরে"। এর বহুবচন হলো শায়াতিন। ش ط ن থেকে এই শব্দটি এসেছে। শয়তান ছিল আল্লাহর একজন বাধ্য বান্দাহ, এমনকি সে ফেরেশতাদের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। শয়তান হচ্ছে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত, যা আগুন দিয়ে তৈরি। তাকে ইবলিসও বলা হয়ে থাকে। ইবলিস হলো জিন জাতির পিতা, যেমন আদম (আ.) হলেন মানবজাতির পিতা। কুরআনে শয়তান শব্দটি ৮৮ বার এবং ইবলিস শব্দটি ১১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, 'শয়তান হচ্ছে জিন ও মানবজাতির মধ্যে থেকে আসা বিদ্রোহী ও অবাধ্য; আর সমস্ত জিনই ইবলিসের বংশধর।'

২. কুরআন থেকে শয়তানের পরিচয়

শয়তান হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্রোহী। শয়তান হলো তার প্রভুর প্রতি সর্বদা অকৃতজ্ঞ। শয়তান হলো মানবজাতির জন্য এক নিশ্চিত শত্রু। শয়তান সবসময় মানবতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শয়তান তার অনুসারীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে। শয়তান কেবল আমাদের আরও দূরে নিয়ে যেতে চায়। শয়তান মানুষকে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا

হে প্রিয় বাবা! শয়তানের উপাসনা করোনা। নিশ্চয় শয়তান পরম করুনাময়ের বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্রোহী। (সুরা মারইয়াম : ৪৪)

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا

নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। (সুরা ইসরাইল : ২৭)

قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًاۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় বৎস! তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না, অথবা তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা ইউসুফ : ৫)

لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا

আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষের সাথে সবসময় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (সুরা ফুরকান : ২৯)

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

নিশ্চয় এরাই হলো শয়তান, এরা তাদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (সুরা আল-ইমরান : ১৭৫)

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং

আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (সুরা নিসা : ৬০)

৩. সকল মানুষের সাথে শয়তান সংযুক্ত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ‏.‏ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏ وَإِيَّايَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ ‏.‏

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে জিনদের কোন সম্পর্ক নেই। তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এমনকি আপনার সাথেও? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন, তাই আমি তার হাত থেকে নিরাপদ এবং সে আমাকে কল্যাণ ব্যতিত অন্য কোন আদেশ করে না। (সহিহ মুসলিম)

কারিনের মূল উদ্দেশ্য হলো আপনার কানে ফিসফিস করে আপনাকে আল্লাহর সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ

আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাত্রে রাসুল (সা.) আমার কক্ষ থেকে বের হয়ে কোথাও চলে গেলে আমি একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে গেলাম। নবী (সা.) ফিরে এসে আমাকে বিচলিত দেখে বললেন, হে আয়শা তোমার কী হয়েছে? তোমার কী ঈর্ষা লাগছে? আমি বললাম, আপনার মতো একজন স্বামী পেয়ে একজন মহিলা কীভাবে ঈর্ষা বোধ করবে না? তখন নবী (সা.) বললেন, তোমার শয়তান কী তোমার কাছে এসেছে? আমি বললাম, আমার সাথে কী শয়তান আছে, ইয়া রাসুলুল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ । আমি বললাম, সে কি সব লোকের সাথে আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার সাথেও কি? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমার রব আমাকে তার উপর সাহায্য করেছেন সে ইসলাম আনার পূর্ব পর্যন্ত। (সহিহ মুসলিম)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ‏.‏ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}.

সাঈদ বিন মুসাইয়াব কর্তৃক বর্ণিত; আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, আদমের সন্তানদের মধ্যে কেউ জন্ম গ্রহণ করে নাই যাকে শয়তান স্পর্শ করে নাই; শুধুমাত্র মারইয়াম ও তার পুত্র ছাড়া। আবু হুরায়রা (রা.) আরও বললেন, আর আমি তোমার নিকট তার জন্য এবং তান সন্তানদের জন্য বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহিহ বুখারি)

৪. শয়তানকে কেন আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন?

وَلَقَدْ خَلَقْنَـٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ (٢١) قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ (٣١) قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٤١) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (٥١) قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (٦١) ثُمَّ لَـَٔاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ (٧١) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (٨١)

আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলিস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বলেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন তুমি এখান থেকে নিচে নেমে যাও। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোমার নেই। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। তুমি হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেওয়া হল। সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোমার পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (সুরা আরাফ : ১১-১৮)

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٤٣) وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٥٣)

সে বললে, আমি তেমন নই যে আমি সিজদা করব একজন মানুষকে যাকে তুমি সৃষ্টি করেছো আওয়াজদায়ক মাটি থেকে কালো কাদা থেকে রূপ দিয়ে।" তিনি বললেন, "তাহলে বেরিয়ে যাও এখান থেকে, কেননা নিঃসন্দেহ তুমি বিতাড়িত, আর নিশ্চয় তোমার উপরে থাকবে অসন্তুষ্টি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।" (সুরা হিজর : ৩৩-৩৫)

৫. শয়তান তাকে অনুসরণ করতে কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে?

- গুনাহকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলে।
- মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ব্যস্ত রাখে।
- অলসতাকে ব্যবহার করে ভাল কাজ থেকে দূরে রাখে।
- আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে হস্তক্ষেপ করে।
- মানুষকে অবৈধ দেবতাদের উপাসনা করতে উৎসাহিত করে।
- মানুষকে আল্লাহ বিদ্রোহী ও আল্লাহর আইন ও নিয়ম প্রত্যাখ্যান করতে উৎসাহিত করে।
- কদরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে।
- গর্ব ও রিয়ার প্রতি আমাদের অনুভূতি জাগিয়ে তুলে।
- ফরজ কাজগুলোকে পিছনে ফেলে দিতে চেষ্টা করে।
- মানুষকে ভুলিয়ে দেয়।
- মানুষকে তার ভুল স্বীকার করতে দেয় না।

৬. শয়তানের সাধারণ ফাঁদ ও কৌশল

ইমাম ইবনুল কাইউম (রা.) তাঁর 'মাদারিজ আস-সালেকিন' বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইবলিস ৭টি দরজা দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে।

- অনুমোদিত কাজে সময় নষ্ট করা।
- দুটি ভাল কাজের মধ্যে কম ভাল কাজে সময় নষ্ট করা।
- বিদয়াত কাজে উৎসাহিত করা।
- ছোট খাটো পাপ কাজে বাধ্য করা।
- বড়ো পাপ কাজে উৎসাহিত করা।
- কাউকে কাফির বানাতে উৎসাহিত করা।
- একটি সর্বাত্মক আক্রমণ করতে উৎসাহিত করা।

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। (সুরা নামল : ২৪)

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (সুরা নিসা : ১১৯)

وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا

আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সুরা ইসরা ৫৩

ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ (٩١)

শয়তান তাদের উপরে কাবু করে ফেলেছে, সেজন্য সে তাদের আল্লাহকে স্মরণ করা ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই হচ্ছে শয়তানের দল। এটি কি নয় যে শয়তানের সাঙ্গোপাঙ্গরা নিজেরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত দল? (সুরা মুজাদালাহ : ১৯)

৭. অভিশপ্ত শয়তানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

- বিদয়াতের কাজে উৎসাহিত করা।
- ছোট খাটো পাপ কাজে বাধ্য করা।
- আল্লাহর ব্যাপারে অবাধ্য করা।
- মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে টার্গেট করা।
- শারীরিক, মানসিক ভাবে ধ্বংস করা।

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? (সুরা মায়দা : ৯১)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (١) مَلِكِ ٱلنَّاسِ (٢) إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ (٣) مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ (٤) ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ (٥) مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ (٦)

বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (সুরা নাস)

ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ধমক দেয়, আর তোমাদের তাড়া করে গর্হিত কাজে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণের এবং প্রাচুর্যের। আর আল্লাহ্, মহাবদান্য, সর্বজ্ঞাতা। (সুরা বাকারা : ২৬৮)

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি-যাতে

তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। (সুরা আরাফ : ২৭)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, "যখন রাত্রি তার ডানা নামিয়ে দেয় বা সন্ধ্যায় প্রবেশ করে, তখন তোমাদের সন্তানদের কে আটকে রাখো, কারণ শয়তানরা সেই সময় ছড়িয়ে পড়ে। যখন কিছু সময় অতিবাহিত হবে, তখন তাদের ছেড়ে দিতে পারেন। তোমার দরজা বন্ধ কর এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ কর, কারণ শয়তান তালাবন্ধ দরজা খুলতে পারে না। তোমরা তোমাদের জল-চামড়া বেঁধে আল্লাহর নাম উল্লেখ কর, তোমাদের পাত্রগুলো যা কিছু আছে তা দিয়ে ঢেকে দাও এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ কর এবং তোমার প্রদীপ নিভিয়ে দাও। (সহিহ বুখারি)

৮. শয়তান কীভাবে রাসুল (সা.) এর সালাতে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছিল?

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا ـ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন নামাজ আদায় করে রাসুল (সা.) বললেন, শয়তান আমার সামনে এসে আমার নামাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর একটি উপরের হাত দিয়েছিলেন এবং আমি তাকে দমবন্ধ করে রেখেছিলাম। কোনো সন্দেহ নেই, আমি তাকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখার কথা ভেবেছিলাম যতক্ষণ না তোমরা সকালে উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন আমার মনে পড়ল, নবী সুলাইমানের বক্তব্য, 'হে প্রভু! আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমার পরে আর কারও হবে না।' তারপর আল্লাহ তাকে (শয়তান) মাথা নিচু করে ফিরিয়ে দেন। (সহিহ বুখারি)

৯. উমর ইবনুল খাত্তাব ও শয়তান

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, হে ইবনে আল-খাত্তাব! তাঁর শপথ যার হাতে আমার জীবন, শয়তান যখন তোমাকে পথ নিতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে! (বুখারি)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ

আল্লাহর রাসুল শপথ (সা.) বলেছেন, "আমি দেখছি, শপথ মানুষদের মধ্যে শয়তান ও জিন 'উমর' থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।" (তিরমিজি)

ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ

যখন উমর প্রবেশ করলেন, শয়তান দাফকে তার নিচে রেখে তার উপর বসে পড়ল। তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, হে উমর! নিশ্চয় শয়তান তোমাকে ভয় করে। আমি এখানে বসা ছিলাম যখন সে এটিকে বাজাচ্ছিল, তারপর আবু বকর আসলেন তখন সে এটি বাজাচ্ছিল, তারপর আলি আসলেন তখনও সে এটি বাজাচ্ছিল, তারপর উসমান প্রবেশ করলেন তখনও সে এটি বাজাচ্ছিল, তারপর যখন হে উমর তুমি প্রবেশ করলে সে দাফটি সরিয়ে ফেলল।" (তিরমিজি)

১০. কেয়ামতের দিন শয়তানের ভাষণ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)

আর যখন ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, "নিঃসন্দেহ আল্লাহ তোমাদের ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা, আর আমিও তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের কাছে আমি খেলাফ করি। আর তোমাদের উপরে আমার কোনো আধিপত্য ছিল না, আমি শুধুমাত্র তোমাদের ডেকেছিলাম, তখন তোমরা আমার প্রতি সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে দোষ দিও না, বরং তোমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারের পাত্র নই আর তোমরাও আমার উদ্ধারের পাত্র নও। আমি নিঃসন্দেহ অস্বীকার করি তোমরা যে ইতোপূর্বে আমাকে অংশী বানিয়েছিলে। নিঃসন্দেহ যারা অন্যায়কারীরা তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (সুরা ইবরাহিম : ২২)

১১. শয়তানের হাত থেকে রক্ষার উপায়

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি থাকা।
সময়মত সালাত আদায় করা।
ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।
কুরআন তেলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা।

নম্র ও ভদ্র আচরণ করা।
সকাল- বিকালের যিকর আদায় করা।
জিহবার হেফাজত করা।
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।
সবসময় ওযুরত অবস্তায় থাকা।
সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করা।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ (٥) وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ (٦) فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ (٧)

অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (সুরা আল-লাইল : ৫-৭)

ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

আপনি পাঠ করুন ধর্মগ্রন্থ থেকে যা আপনার কাছে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, আর নামাজ কায়েম করুন। নিঃসন্দেহ নামাজ অশালীনতা ও অন্যায়াচরণ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বোত্তম। আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (সুরা আনকাবুত : ৪৫)

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (সুরা ফাতির : ২৮)

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সুরা আরাফ : ২০০)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (সুরা নিসা : ৭৬)

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি। (সুরা হাশর : ১৬)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। (সুরা আন নূর : ২১)

মহানবীর বিদায় হজের ভাষণ

> "তোমাদের ধর্মের নিরাপত্তার জন্য তোমরা শয়তানকে সাবধান থাকবে, সে তোমদের উপর সমস্ত আশা ভরসা হারিয়ে ফেলছে যে, তোমাদেরকে বড়ো জিনিসের ব্যাপারে বিপথে পরিচালিত করার ব্যাপারে। তাই ছোট ছোট জিনিসের ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করা থেকে সাবধান থাক।"

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ. وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

আর বল, আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে, আর আমার প্রভু! তোমারই কাছে আমি আশ্রয় নিচ্ছি পাছে তারা আমার কাছে হাজির হয়।" (সুরা মুমিনুন : ৯৭-৯৮)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি বিতাড়িত শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি। (আবু দাউদ)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহর নিখুঁত বাক্যের আশ্রয় চাইছি তাঁর সৃষ্ট মন্দতা থেকে। (আবু দাউদ)

লেখক: জেনারেল সেক্রেটারী, মুসলিস কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

শীতকাল বহুমুখী নেক আমলের সুবর্ণ সুযোগ

শায়খ আবদুল কাইয়ুম

শীতকাল মুমিনের জীবনে বহুমুখী ইবাদতের এক সুবর্ণ সুযোগ। শীতকালে অনেকগুলো ইবাদত করা সহজ, যা অন্য সময়ে এত সহজে করা যায় না। তন্মধ্যে অন্যতম ইবাদত নফল রোজা যা গ্রীষ্মকালে লম্বা দিনের কারণে অনেকেই হিম্মত করতে পারে না। তাদেরকে শীতকালের এ নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

ألا أدلكم على الغنيمة الباردة ، قالوا : بلى، فيقول : الصيام في الشتاء

আমি কি তোমাদেরকে শীতল গনীমত সম্পর্কে আমি বলব? তারা বললেনঃ অবশ্যই। তিনি বললেন: শীতকালে নফল রোজা হচ্ছে শীতল গনিমত। (মুসনাদ আহমাদ/বায়হাকী/মুসান্নাফ আবি শাইবা)।

কারণ: শীতকালে দিন ছোট হওয়ার কারণে নফল রোজা রাখা অনেক সহজে। আর লম্বা রাতের কারণে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা ও সহজ। যা অন্য সময়ে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমরা সবাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই এবং জান্নাতে যেতে চাই, কিন্তু আমাদের ইবাদত– আমলের যে দুরাবস্থা, তা দিয়ে কি করে এত বড়ো সফলতা অর্জন হতে পারে। জান্নাতের জান্যে তো অনেক উচ্চমূল্য প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن أبي هريرةرضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي: ٥٤٢ / حسن

জেনে রেখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রেখো আল্লাহর সামগ্রী হচ্ছে জান্নাত। (তিরমিজি, হাসান)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل

ফিরিশতাগণ পবিত্র ও উত্তম মানের মুমিনদের মৃত্যু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, তোমাদের নেক আমলগুলোর বিনিময়ে। (সুরা নাহল : ৩২)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্ন দেখলে তাঁর কাছে এসে স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তা শুনে, আল্লাহর ইচ্ছায় যা বলার তিনি তাদেরকে তা বলতেন। আমি তখনও বাল্য বয়সের। বিয়ের আগে আমি মসজিদেই থাকতাম। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, তোমার মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকত তা হলে অন্যরা যে ভাবে স্বপ্ন দেখে, তুমিও সে ভাবে কিছু দেখতে! একদিন রাতে ঘুমাতে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আমার মধ্যে যদি ভালো কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন, তাহলে আমাকে স্বপ্ন দেখান। এরপর দেখতে পেলাম, আমার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসলেন। উভয়ের হাতে রয়েছে লোহার তৈরি হাতুড়ি, তারা দু'জনে ধরে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনের মাঝখানে থেকে আমি শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, 'হে আল্লাহ! আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। অতঃপর লোহার হাতুড়ি ওয়ালা আরেকজন ফিরিশতাকে দেখলাম, তিনি বললেন– ভয় পেয়োনা; তুমি তো ভালো মানুষ! তবে আরেকটু যদি বেশি নফল সালাত আদায় করতে!

তারা আমাকে ধরে নিয়ে একদম জাহান্নামের তীরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জাহান্নামকে দেখতে মনে হলো সেটা একেবারে পাকা কুয়ার মতো। কুয়ার পাশে অনেকগুলো খুঁটি গাড়ানো আছে। প্রত্যেক দু খুঁটির মধ্যখানে একজন ফিরিশতা আছেন লোহার হাতুড়ি নিয়ে। জাহান্নামের ভিতরে কিছু লোককে দেখতে পেলাম শিকল দিয়ে বাঁধা, তাদের মাথা নিচের দিকে ঝুলানো। তথায় আমি কুরাইশদের কিছু লোককে দেখে চিনে ফেললাম। ফিরিশতাগণ আমাকে ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি (আমার বোন) হাফসা (রা.) কে স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। তিনি তা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বর্ণনা করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, আব্দুল্লাহ তো নেক-কার মানুষ। যদি সে রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়তো! ছালেম বলেন, এরপর তিনি রাতের অল্প অংশয় ঘুমাতেন। (বুখারি ও মুসলিম)

শীতকালে ক্বিয়ামুল্লাইলের পর নফল রোজার সুযোগ ও যেন আমরা হাত ছাড়া না করি। আর শীতকালে নফল রোজার আমলে অভ্যস্থ হলে গ্রীষ্মকালেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফিক দেবেন। সারা বৎসর দু ধরনের নফল রোজার চর্চা করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। একটি হাদিসে সোম এবং বৃহস্পতিবারের রোজার গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন,

تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملى وأنا صائمٌ : الترمذى

(বান্দার) আমল সমূহ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার (আল্লাহর কাছে) পেশ করা হয়, সেজন্যে আমি চাই আমার আমলগুলো (আল্লাহর কাছে) এমন অবস্থায় পেশ করা হোক যে আমি তখন রোজা অবস্থায় আছি। (তিরমিজি, হাসান)

আরেকটি হাদিসে মাসের মাঝখানের তিনদিনের রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন–

أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ مَا عِشْتُ: بصِيامِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. /مسلمٌ.

আমার প্রিয় নবী (সা.) আমাকে তিনটি আমলের জন্যে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়ে গেছেন। যতদিন বেঁচে থাকব, তা কখনও ত্যাগ করব না। প্রতিমাসের (মধ্যখানের) তিন দিনের (১৩, ১৪, ১৫) রোজা, সালাতুদ্বোহা (চাশতের নামাজ) আর বিতর না পড়ে না ঘুমানো। (মুসলিম)

শীতকালের অন্যতম ইবাদাত হচ্ছে– কনকনে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গরিব দুঃখীদেরকে শীতবস্ত্র দান করা। গাজা, ফিলিস্তিন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শরণার্থীদেরকে শীত বস্ত্র, খাদ্য পানীয় চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যে সাহায্য করা আল্লাহর কাছে অনেক বড়ো আমল হিসেবে সমাদৃত হবে। ইমাম ইব্ন রজব আল-হাম্বলী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত লাতাইফ আল মাআরিফ গ্রন্থে উল্লেখ করেন–

মদিনার একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছাফওয়ান বিন ছুলাইম ছিলেন মদিনার অন্যতম একজন ফকিহ, আবেদ এবং মহানুভব ব্যক্তি। তিনি এক কনকনে শীতের রাতে মসজিদ আন-নাবাওয়ী থেকে বের হয়ে দেখলেন খালি গায়ে প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে একজন হত দরিদ্র মানুষ। নিজের গায়ের জামা খুলে তাকে পরতে দিয়ে নিজে খালি গায়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি চলে গেলেন। এ ঘটনার পর সিরিয়াতে এক আল্লাহর বান্দাহ স্বপ্ন দেখলেন। একজন মানুষকে গায়ের কাপড় খুলে পরতে দেওয়ার কারণে ছাফওয়ান জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তিনি মদিনায় এসে খোঁজ করলেন ছাফওয়ানকে দেখতে এবং তাকে এ স্বপ্নের কথা জানালেন। আসুন আমরা শীতের এবাদতগুলোর আমল মনোযোগ দিয়ে শুরু করি। নিম্নের হাদিসটি দিয়ে উপসংহার টানি–

عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام وصلى والناس نيام ". الترمزي: حسن

আবু মালিক আল আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জান্নাতে এমন সব অট্টালিকা বা কক্ষ রয়েছে, যেগুলোর ভেতরে থেকে বাইরের সব কিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যাবে। আল্লাহ সেগুলোকে তৈরি করে রেখেছেন ঐসব লোকদের জন্যে, যাদের কথায় বার্তায় রয়েছে ভদ্রতা ও নম্রতা, যারা ক্ষুধার্তকে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করে, রোজার পর রোজা রাখতে থাকে, আর মানুষ যখন রাতের বেলায় ঘুমে অচেতন তখন তারা তাহাজ্জুদ আদায় করে থাকে। (তিরমিজি, হাসান)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ধরনের আমলগুলো বেশি বেশি করে করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : ইসলামী স্কলার, ইমাম ও খতিব- ইষ্ট লন্ডন মসজিদ।

এক নীরব দাঈ ইলাল্লাহ

আমাদের প্রিয় আসলাম ভাই

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান

পরিচিতি

নাম: মুহাম্মদ আসলাম উদ্দীন, বয়স: ৫৪ বছর, পিতা: মৃত জনাব নুরুদ্দীন সাহেব, মাতা: মৃত যুবেদা আক্তার।

দেশের ঠিকানা: গ্রাম: মুল্লাপুর, ডাকঘর: নিদনপুর, থানা: বিয়ানীবাজার, জেলা: সিলেট, বাংলাদেশ।

পরিবার: রানা হুসাইন ও ইমরান হুসাইন নামে ছোট দু'ভাই। দু'ভাই তাদের সন্তানাদিসহ লন্ডনে বসবাস করেন। আসলাম ভাই বিয়ে করেছেন ১১ই অক্টোবর'১৯৯২ অর্থাৎ মাত্র ২২ বছর বয়সে। স্ত্রী ছাড়াও, হানিফ, আরিফ ও ইসমাইল নামে ৩ ছেলে এবং হামিদা ও ওয়াহিদা নামে দু'মেয়ে রেখে গেছেন। প্রথম মেয়ে ও বড়ো দু'ছেলে বিবাহিতো এবং নাতি-নাতিন নিয়ে তিনি বসবাস করতেন লন্ডনের স্টেপনী এলাকায়। এর পূর্বে তিনি পিতা-মাতার সাথে ছোটবেলা থেকেই বসবাস করতেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের পাশে ফোর্ডহ্যাম স্ট্রীটে। বছর কয়েক থেকে সরকারি ঘর পেয়ে মসজিদ থেকে একটু দূরে মাইল্যান্ড এলাকায় পরিবারসহ চলে যান এবং সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। তাঁর পরিবারেও তিনি নামাজি, সৎ এবং দ্বীনদার হিসেবে অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মজীবন

আসলাম উদ্দীন শৈশব, কৈশোর ও ফোর্ডহ্যাম স্ট্রীটে কাটিয়েছেন। তিনি এখান থেকে স্কুল ও কলেজ লাইফ অতিবাহিতো করেছেন। তার খেলার সাথীরাও এই এলাকার বাসিন্দা ছিল। আসলাম ভাইয়ের ইন্তেকালে আজকে তারা খুবই ভারাক্রান্ত, শোকার্ত। মানুষ আপন ভাইয়ের মৃত্যুতে যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি আসলাম ভাইয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবসহ সবাইকে আল্লাহ সবরে জামিলের তৌফিক দিন। আসলাম উদ্দীন সাত বছর বয়সে বাবার সাথে লন্ডন এসে থাকলেও স্কুল যেতে আরও কিছু সময় লেগেছে। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের সাথে প্রায় ১৭/১৮ বছর বয়সে তিনি স্টেপনিগ্রীণ সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে যে, বিয়ের পর তিনি জি.সি.এস.ই, এ.লেভেল এবং পরবর্তীতে লন্ডন মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটি থেকে এন.ভি.কিউ ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং সর্বশেষে আই.টি কনসালটেন্সীর উপর মাস্টার্স করেছেন'২০১৯ এ।

কর্মজীবন

আসলাম ভাই তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ফ্যাক্টরীর কাজের মধ্য দিয়ে। প্রথমেই তিনি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। কাজের জায়গায় তিনি বয়সে ছোট হলেও শিক্ষার কারণে সবাই তাঁকে সমীহ করত এবং স্নেহের চোখে দেখতো। তারপর অন্যান্য ছোটখাট কাজ করলেও অবশেষে কাউন্সিল অব মস্কের অফিসে স্থায়ী এডমিন জব ধরেন। জীবনের শেষ সময়ে অসুস্থ হয়েও এ জব তিনি ছাড়েননি এবং তাঁর জবে অন্যতম বস ছিলেন তাঁরই ছোট বেলার বন্ধু আমাদের আরেক প্রিয় দ্বীনি ভাই সিরাজুল ইসলাম হীরা।

পারিবারিক জীবনেও দ্বীনি চেতনা

পারিবারিক জীবনেও তাঁর দ্বীনি চেতনা ছিল খুব শক্ত। তিনি খুব বাস্তবধর্মী মানুষ ছিলেন, ফলে বিবাহ-শাদী তাঁর পড়া-লেখা যেমন ব্যাহতো করতে পারেনি, তেমনি বাস্তব সিদ্ধান্তের কারণেই সকল পড়ালেখা বিয়ের পর শেষ করেছেন। এমন কাজ কঠিন সিদ্ধান্ত এবং স্ত্রীর সহযোগিতা না থাকলে সম্ভব হতো না। আমাদের জানামতে আসলাম ভাইয়ের স্ত্রী আমাদের ভাবীও একজন পাক্কা দ্বীনদার মহিয়সী মহিলা এবং দ্বীনি সংগঠনের একজন নিরলস কর্মী। তাঁরা উভয়ে দ্বীনদার হবার কারণে তাঁদের সন্তানগুলোও আল্লাহর রহমতে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে ঐ ছোটকাল থেকেই। এমন উদাহরণ আমাদের সমাজে কয়জনের পরিবারে আছে? ভাই ও ভাবীর এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন এবং সন্তানগুলোকে অবশিষ্ট জিন্দেগী ইসলাম অনুযায়ী চলার তৌফিক দিন।

সংগঠনে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন

আসলাম ভাই তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কৈশোর বয়সেই অর্থাৎ ১৪/১৫ বছর বয়সেই 'ওয়াই.এম.ও' তে যোগদান করেন। বৃটেনে আগত বাংলাদেশী যুবকদের সুপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত এটি একমাত্র সংগঠন ছিল। ঐ সময়ে যার কোনো বিকল্প ছিল না বলা যায়। ফলে আসলাম ভাইয়ের মত আরও যারা ঐ সময়ে পিতা-মাতা কিংবা কোন আত্মীয়ের সাথে এ দেশে পাড়ি জমিয়েছিল, তাদের ইসলাম পাওয়ার আর কোন পথ তখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই যারাই ঐ সময়ে এসেছিল তারা সবাই মিলে ওয়াই.এম.ও করত অর্থাৎ একসাথে নামাজ পড়া, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা সবই ছিল তাদের দৈনন্দিন তৎপরতার অংশ এবং পরস্পরের সঙ্গী ছিল মূলত ঐ বন্ধু-বান্ধবরা।

তাঁর দশ বছর পর অর্থাৎ ২৪ বছর বয়সে 'ইসলামিক ফোরাম অফ ইউরোপ' বা আই.এফ.ই তে তিনি সম্ভবত ১৯৯৮/৯৯ সালে যোগদান করেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা থাকায় সংগঠনের বই-পত্র পড়ে অন্যদের তুলনায় খুব কম সময়ে সংগঠনে এগিয়ে আসতে পেরেছেন। ইসলামের দাওয়াতি কাজের দীক্ষা ঐখান থেকেই, সংগঠনের রিপোর্ট রাখা, নিয়মিত মাসিক সাহায্য (এয়ানত) দিতে অভ্যস্ত হওয়া, কর্মী যোগাযোগ করে সবাইকে নিয়ে একসাথে চলতে পারার মত কঠিন কাজগুলো করতে তাঁর ট্রেনিং ছিল ভালো, ফলে এসব কাজে তাঁর কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। সবার কাছে তিনি একজন জনপ্রিয় তাক্বওয়াওয়ালা ব্যক্তিত্ব হতে পেরেছেন বলেই তাঁকে প্রথমত ২০০৪ এ লন্ডনের একটি শাখার প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬-১০ সাল পর্যন্ত আই.এফ.ই-এর লন্ডন শাখার দু'বারের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে আই.এ.পি তে যোগদান। আই.এ.পি হচ্ছে 'ইসলাম এ ওয়ারনেস প্রজেক্ট'। এটি ইস্ট লন্ডন মসজিদের অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে গঠিত দাওয়াতি কাজের একটি প্ল্যাটফরম।

দ্বীনের এক নীরব দাঈ : আমাদের আসলাম ভাই যে এতটা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তা আমরা আগে জানতাম না। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশেষকরে টাওয়ার হামলেটের ছোট-বড়ো প্রায় ৬০টি মসজিদের চেয়ারম্যান-সেক্রেটারী, ইমাম ও খতীবগণ এমনকি মুসল্লীদের মাঝথেকে অনেকেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সুন্দর নামাজ, চরিত্রের ভালো গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করছেন। এমনকি দাফন শেষে মিশরের স্বনামধন্য শায়েখ আবু আহমেদ তাঁর দ্বীনদারীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'কাউন্সিল অফ মস্কে'র চেয়ারম্যান জনাব মাওলানা হাফিয শামসুল হক সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে দীর্ঘ দোয়া করেছেন। আমাদের স্থানীয় মস-জিদের ইমাম হাফিয মুইন হক্ব আসরের নামাজের পর আগামীকাল আসলাম ভাইয়ের জানাযায় সবাইকে ইস্ট লন্ডন মসজিদে বাদ জোহর শরীক হবার অনুরোধ জানিয়ে শাহজালাল মসজিদে এলান করে দীর্ঘ দোয়া করেছেন। আসলাম ভাইয়ের জন্য এত সুন্দর এলান করেছেন, যা আমি আর কারও বেলায় আমাদের ঐ ইমাম সাহেবকে করতে শুনিনি।

ভালো কাজের ফলাফল ভালো

আসলাম ভাই ভালো মনের একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর সাথে যারাই চলেছেন, তাঁরাই এ কথার স্বাক্ষী দেবেন যে, তিনি কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে সবার কাছে একজন প্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি কাউকে কষ্ট দেননি, কাউকে হেয় করে কথা বলেননি, কারো বদনাম করেননি, কারও পিছে কথা বলেননি। তাঁর শেখার অভ্যাসটি ছিল খুবই অনুকরণীয়, আমাকে পেলেই পাশে বসতেন, জিজ্ঞেস করতেন অনেক কিছু, সামাজিক, পারিবারিক, সাংসারিক, ধর্মীয় মাসয়ালাসহ অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করতেন। আমার ইভিনিং মাদ্রাসার কয়েকটি ক্লাস ছিল তাঁর অফিসের পাশেই, সেই সুবাদে প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা হতো, তিনি চা এর দাওয়াত দিতেন এবং আমরা দু'জনে প্রায় একসাথে চা খেতাম, একসাথে সময় কাটাতাম, বিভিন্ন বিষয়ে শেয়ার করতাম। একবার এক ট্রেনিগ ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে অফিসে আমার সাথে দেখা হতেই প্রশ্ন করে বসলেন, "ইমাম সাহেব আপনাকে খুঁজছি 'বলুন তো, আক্বীদাহ অসাতিয়াহ কাকে বলে? এবং এর ইতিহাস কি? এবং আমাদের জন্য এ জাতীয় আক্বীদাহ পোষণ করা কী ঠিক আছে?" আমি দুষ্টামী করে বললাম, টিসি'র প্রশ্ন টিসি থেকে কেন শিখে আসলেন না, এখন আমাকে ডিস্টার্ব করছেন, ঠিক আছে, দশ পাউন্ড করে তিন প্রশ্নে ৩০ পাউন্ড লাগবে, পছন্দ হলে অফিসে আসবেন। তিনিও বললেন, নগদ চা খেয়ে যান, ফি পরে দেওয়া যাবে। চা খাওয়া নিয়ে তাঁর আমার মধ্যে রসিকতা প্রায়ই হতো। এমন একজন প্রাণবন্ত দ্বীনদার মানুষ ছিলেন আসলাম ভাই। হাসিমুখে থাকতেন প্রায়ই কোন কষ্টে থাকলে কাউকে তা বুঝতে দিতেন না।

কারো মৃত্যুর পর কেউ তাঁকে ভালো বলে স্বাক্ষী দিলে আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করেন বলে ২/৩টি হাদিসে এসেছে। একবার রাসুল (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এক বৈঠকে ছিলেন তখন তাঁদের পাশ দিয়ে জানাযার জন্য এক ব্যক্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা দেখে সাহাবীরা কৌতুহল বশতঃ একে অপরকে জিজ্ঞেস করছেন যে, এ কার লাশ? জবাবে তারা বলাবলি করছেন যে, এ অমুক ভালো ব্যক্তি যার কোন তুলনা হয় না, সে এমন এমন ভালো কাজ করেছে সবাই তাঁকে ভালো বলে জানে এবং সবার কাছে তিনি প্রিয়জন বলে স্বীকৃত ছিলেন ইত্যাদি। তাঁর ব্যাপারে অনেক ভালো কথা বলতে রাসুল (সা.) শুনে মন্তব্য করলেন 'অজাবাত'। সাহাবীরা তাঁর মন্তব্য বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এর মানে কী? তাঁর জন্য কী ওয়াজিব হলো? তিনি জবাব দিলেন "তোমাদের মন্তব্যগুলো আল্লাহ শুনেছেন এবং তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" তাহলে ভালো কাজ করে গেলে মানুষ ভাল বলে স্বাক্ষী যখন দেয়, তা মৃত ব্যক্তির বড়ো উপকারে আসে। এই ভাল স্বাক্ষীর উদ্দেশ্যেই আজকের এ প্রবন্ধ ভাইয়ের জন্য ওয়াক্বফ করলাম। তবে এ হাদিসটি অনেকে ভুল বুঝে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের সমাজে এক ধরে-নর লোক আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাজার পূর্বক্ষণেই উপস্থিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করে যে, 'তিনি কি ভাল মানুষ ছিলেন?' সবার কাছ থেকে এভাবে সম্মতি আদায় করে নিয়ে নেয়, যা এ হাদিসের অর্থের সাথে সংঘর্ষিক।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রজেক্ট

অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে মসজিদের প্রজেক্ট হিসেবে যে টিম দাওয়াতি কাজ করত, তিনি তাদের সাথে থেকে সহায়তা করতেন। মসজিদের পক্ষ থেকে সবসময় একটি

ডেডিকেটেড রুম দেওয়া হয়, যেখানে আসলাম ভাই তাঁর টিম নিয়ে নিয়মিত কাজ করতেন। সে টিম অনেকগুলো দাওয়াতি কাজের আঞ্জাম দিত, যার সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- ওপেন ডে'র ব্যবস্থাপনা এলাকায় অবস্থানরত অমুসলিম বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মীদের ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য সকাল ১০ ঘটিকা হতে বিকেল ৫ ঘঠিকা পর্যন্ত মসজিদের দরজা উন্মুক্ত করে রাখা হয়। এ সুযোগে অনেক অমুসলিম ইসলাম জানতে আসেন। মসজিদের পক্ষ থেকে ওপেনডে যখন করা হতো, তখন মোটামুটি দাওয়াতি কাজের একটা সাড়া পড়ে যেত, শায়েখ আব্দুল কাইউমসহ আমরা ইমামগণ রেডি থাকতাম যে অনেক শাহাদাহ এ উইক্যান্ডে হবে। অমুসলিম পুরুষ-মহিলা অনেকেই আসবে ইসলাম কবুল করতে। তাদের উপহার সামগ্রী হিসেবে ইংরেজিতে এক কপি কুরআন, কিছু বই-পুস্তক, নামাজের সময়সূচি ইত্যাদি ইসলাম শিখার প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হতো। তাছাড়া এ দাওয়াতি কাজের অংশ হিসেবে মসজিদের মুসল্লীদের সহযোগিতা নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা একদিন মসজিদে কালেকশন করতাম, মাশাআল্লাহ জোহরের ফরজের পর ঘোষণা দিলেই মুসল্লীগণ পকেটের পয়সা উজাড় করে দিতেন এবং এখনও দেন। এ অভ্যাসটি সবার জানা। আসলাম ভাই ও নাজমুল ভাই তাদের টিমসহ বাকেট হাতে নিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন।
- দাওয়াতি লিফলেট বিতরণ: এ উপলক্ষ্যে অনেক লিফলেট ও বুকলেট ছেপে মসজিদের পক্ষ থেকে আসলাম ভাইয়ের টিম ও মসজিদের ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয় এবং অনেক মুসল্লী নিজেরা নিজেদের পরিচিত সহযোগী, সহকারী, বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত করে আনতে লিফলেট নিয়ে যেতেন এবং কোন কোন সময় তাদের এনে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন।
- বুকলেট সংগ্রহ করা: তাঁর দায়িত্বের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় কাজ ছিল যে, তিনি অনেকগুলো আরব কমিউনিটির মসজিদ এবং দাওয়া সংস্থার সাথে খুবই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে অনেকগুলো বই, লিফলেট, বুকলেট এবং বিভিন্ন ভাষায় ছাপা কুরআনের অসংখ্য কপি সংগ্রহ করে দাওয়াতি কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতেন। যাদের কাছ থেকে তিনি এ দাওয়াতি সামগ্রী আনতেন তাদের অন্যতম ছিলো ফী সাবিলিল্লাহ, ইউকে আইএম, রিজেন্টস পার্ক মসজিদ, মে ফেয়ার মসজিদ ও বিভিন্ন ফ্রি পাবলিকেশন্সসহ আরও অনেকে।
- ইংরেজীতে কুরআন ছাপা: দীর্ঘদিন থেকে অমুসলিমদের জন্য শুধু ইংরেজিতে কুরআন ছাপাবার পরিকল্পনা ছিল, এ কাজটি অনেক দিন থেকে কেবল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থেকেছে, কিন্তু বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। এটি আসলাম ভাইয়েরও অন্যতম স্বপ্ন ছিল। অবশেষে সংগঠন থেকে সকল ইউনিটে ফান্ড সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়ে বাজেট ভাগ করে দেওয়া হয় এবং একই সাথে এ বাজেট অনুযায়ী কালেকশন শুরু হয়। কুরআন প্রজেক্ট পরবর্তীতে মিশর থেকে পড়াশোনা করে চলে আসা ভাই মইনুল হক্বের উপর অর্পণ করা হয়। তখন আসলাম ভাই আই.এ.পি এর একক প্রজেক্ট হিসেবে শাহাদাহ ও 'টি এন্ড টোর' এর দায়িত্ব নেন। এ দায়িত্ব তিনি এ.এল.এম এর সাথে যৌথভাবে চালিয়ে যান।
- বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতি স্টলের ব্যবস্থা: মসজিদের দাওয়াতি কাজের অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবকগণের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে তিনি বিভিন্ন স্থানে তাদের নিয়মিত পাঠাতেন। কোনো কোনো মসজিদে আবার এক্সিবিশন জন্য আসলাম ভাই বা রায়হান ভাইকে ডেকে পাঠানো হতো। তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষকে ট্রেনিং দিতেন এবং বাস্তবে দাওয়াতি কাজ কি-ভাবে করতে হয় তার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসতেন।
- ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা: এ দাওয়াতি কাজে সহায়তার জন্যে বেশ কিছু যুবক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হতো। এ জন্যে তিনি প্রায়ই ফোন করে এম.সি.এ. এর দায়িত্বশীলদের বলে ভাইদেরকে ডেকে আনতেন। তারাও আসলাম ভাইয়ের ডাকে এ ভাল কাজে শরীক হতে আনন্দবোধ করত।
- শাহাদার ব্যবস্থা (সাদা-কাল, পুরুষ-মহিলা): যখনই কোন অমুসলিম ইসলাম কবুল করতে পড়ালেখা করে রেডি হয়ে গেলেই আসলাম ভাই তাদের নিয়ে আসতেন ইমামদের কাছে। আসলাম ভাই নিয়ে আসলে আমরা আর খুব বেশি চেক করতাম না। কেননা আসলাম ভাইয়ের উপর আমাদের সুধারণা ছিল। যেহেতু তিনি দীর্ঘ দিন থেকে এ কাজে পটু, তাই কম জিজ্ঞেস করেই আমরা শাহাদাহ দিয়ে দিতাম। কোন সপ্তাহে অমুসলিম না পাওয়া গেলে আসলাম ভাইকে তামাশা করে বলতাম যদি কাউকে না মিলে তাহলে আপনাকে শাহাদাহ দিয়ে দেব, রাজী আছেন তো?
- কভিড'১৯ এ অমুসলিম দাওয়াহ: কভিড'১৯ এর সময়ে যখন সমগ্র দুনিয়া স্থবির হয়ে সবাই ঘরে উঠে গেছে এবং সমাজ একদম নিরব-নিস্তব্দ। তখন আসলাম ভাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যক্তিগত দাওয়াতি কাজ অব্যাহত ছিল। তাঁর দাওয়াতি কাজের বেশ কিছু নেটওয়ার্ক ছিল। যার সাহায্যে তিনি মোবাইল দাওয়াতি কাজ জারী রেখেছিলেন এবং আশ্চর্য্য হবার মত দুঃসাহসিক কিছু কাজ করতে পেরেছিলেন। দুনিয়া বন্ধ থাকলেও কিভাবে তিনি দাওয়াত দিয়ে মানুষকে শাহাদার জন্য রেডি করে ফেলতে পারতেন। এ পদ্ধতি তিনি ভালো জানতেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদসহ যখন মসজিদগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আমিও বাসায়, আমাকে একদিন ফোন করে এভাবে বুক করে ফেললেন যে, যদি আমি কোন অমুসলিম লোক সংগ্রহ করতে পারি আপনি কেবল কথা-বার্তা বলে শাহাদাহ দিতে রেডি আছেন কি? আমি সুযোগ পেয়ে জলদি রাজী হয়ে গেলাম, কেননা এ কাজ তো ইমাম হিসেবে আমাদেরই। দ্বীনের দাওয়াতি কাজের এ মহা সুযোগ মসজিদ বন্ধ হলেও এটি যেন চলে, মসজিদ বন্ধ হয় হোক, কিন্তু ইসলাম কবুল করা যেন বন্ধ না হয়। আমার যতদূর

মনে পড়ে ঐ সময়েই সবচেয়ে বেশি অমুসলিমরা ইসলামের ছায়াতলে এসেছে উনার মাধ্যমে।

- অমুসলিম ডিনার ও তাঁর ব্যবস্থাপনা: আসলাম ভাই যখন আই. এফ.ই. লন্ডনের দায়িত্বে ছিলেন, তখন বা তাঁরও পূর্ব থেকে আসলাম ভাই এ প্রজেক্টে জড়িত ছিলেন। লন্ডনের বাংলা বিভাগের ভাই ও বোনেরা তাদের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বছরে দু'বার স্থানীয় স্কুল টিচার, অমুসলিম ব্যক্তিত্ব, ডাক্তার, সলিসিটর এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের দাওয়াত করে 'অমুসলিম ডিনার' শিরোনামে সবাইকে ডেকে আনতেন ইসলামের দাওয়াত দেবার উদ্দেশ্যে। এ কাজটি দায়ীদের বড়োই আনন্দ দিত এবং সবাই খুবই গুরুত্বের সাথে এ কাজটি আঞ্জাম দিত। এ কাজেও আসলাম ভাই আন্তরিকভাবে জড়িত ছিলেন। বছরের মধ্যখানে অমুসলিমরা জিজ্ঞেস করত, 'কখন তোমরা খাওয়ার দাওয়াত দেবে?'
- স্ট্রীট দাওয়াহ: স্ট্রীট দাওয়াহর ধারণা দীর্ঘ দিন থেকেই। এটি নতুন নয় বরং কোনো কোনো সময়ে তা করা হয়েছে। বিশেষ করে এ দাওয়াহ কাজটি কোনো আন্ডার গ্রাউন্ড স্টেশনের পাশে করলে সহজে সফল হয় অর্থাৎ অমুসলিমরা বই-পত্র বা কুরআনের ইংলিশ কপি নিয়ে যায় এবং অনেকেই পড়ে ফিড ব্যাক দেয়, যাতে আমরা আরও বেশি উৎসাহিতো হই। এ কাজটি পরবর্তীতে আমরা আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংগঠন থেকে সারা দেশে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছি এবং প্রায় বড়ো বড়ো শহরে তখন শুরু হয়েছে। সংগঠন থেকে এক লক্ষ কুরআন ইংলিশ ভাষায় টার্কি থেকে ছাপিয়ে আনা হলো। সবাইকে বিতরণ করা হলো ফ্রিতে এবং বলে দেওয়া হলো, কেউ যদি ফ্রি চায় দিয়ে দেবেন, তবে তাদেরকে ছাপার খরচ বাবত এক পাউন্ড করে চাইবেন, এতে আমাদের পুনঃছাপার কাজটি সহজ হবে।
- টি এন্ড টুর (নতুন একটি প্রজেক্ট, যেটার উদ্যোক্তা তিনিই): আসলাম ভাই আই.এ.পি এর একক প্রজেক্ট হিসেবে 'টি এন্ড টোর' এর দায়িত্বে ছিলেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁর সাথে এ দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেছেন যারা তাদের মধ্যে ইতালী প্রত্যাগত বেলাল হুসাইন ভাই ও ভাতিজা হানিফসহ আরও অনেকে। আমি এম.সি.এর দাওয়া বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম বলে এ কাজে আমাকেও শরীক করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, যে জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি।

আমাদের প্রিয় আসলাম ভাই ২০২২ এর মাঝামাঝির দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমরা খবর পেয়েই খোঁজ-খবর নিতে যখনই শুরু করি তখন এতটা মারাত্মক হয়নি। তাই তিনি স্থানীয় চিকিৎসা ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় গিয়েছেন। এক পর্যায়ে ইংল্যান্ডের চিকিৎসা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আরোগ্যের কোন লক্ষণ তো ছিলো না। পরিবারসহ সবাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন তাঁর সন্তানরা। বড়ো ছেলে হানিফ ও তাদের চাচারা জার্মানিতে একজন ডাক্তারের সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। চিকিৎসা শেষে সেখানকার ঔষধপত্র নিয়ে অনেকটা বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন। তারপর সন্ধান পাওয়া গেছে যে, এ রোগের চিকিৎসা নাকি কানাডায় আছে। খবর পেয়ে এখন কানাডায় যাবার সকল প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঐখানে সাহায্য করার মত কেউ আছেন কিনা আমার সাথে যোগাযোগ করলেন ভাবী ও বড়ো ভাতিজা হানিফ। অনেক চেষ্টা করেও আশানুরূপ সাহায্য করা গেলো না তবুও তারা যাবেনই। অবশেষে আল্লাহর উপর ভরসা করেই রওয়ানা দিয়েছেন রুগীর সাথে আরও চারজন। চিকিৎসা করে কিছুদিন পর ফিরে এসেছেন, কিন্তু ততটা ফল পাওয়া যায়নি ঐখানেও। শেষ পর্যন্ত নিজ হাসপাতাল আর বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিয়ে বাকি সময়টা অতিক্রম করতে হয়েছে আসলাম ভাইকে। সময়ের ব্যবধানে ছেলেরা পরে তাঁকে পাশে থেকে খেদমত করবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে হাসপাতাল থেকে কায়দা করে বাসায় নিয়ে এসেছেন।

পরিবার ও সন্তানদের ত্যাগ

সবচেয়ে বড়ো শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আসলাম ভাইয়ের পরিবার ও তাঁর সন্তানরা যে ত্যাগের পরাকাষ্টা দেখিয়েছে তা অপর কারো সন্তান এতটা করবে কিনা জানি না। তবে যতদূর আমরা জেনেছি যে, তাঁর সন্তান ও ভাইয়েরা অসম্ভব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের আপন জনের চিকিৎসার জন্যে। তারা যখন যেখানে চিকিৎসা আছে খবর পেয়েছে তারা কাল বিলম্ব না করে পয়সা-পাতি যোগাড় করেই রওয়ানা দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি তারা করেনি। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা নিয়ে যেতে চাইলে কোন চিকিৎসা কাজে আসে না। আসলাম ভাই এমন একটি সফল ব্যক্তি যার পরিবার তাঁর হক আদায় করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাদেরকে এজন্য আজরে আযীম দান করুন।

অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে হঠাৎ খবর এল যে, আসলাম ভাইকে দেখতে চাইলে বাসায় যেতে পারেন। ঐ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অনেকেই তাঁর বাড়িতে ভীড় করেছেন দেখার জন্য। কিন্তু ভাই যে আর বেশি দিন আমাদের মধ্যে থাকবেন না ততক্ষণে এটি অনেকেরই জানা হয়ে গেছে। এর মধ্যেই গত ১৫ই সেপ্টেম্বর'২০২৩ জুমাবার রাত পার হয়ে সকাল ৯:১৫ মিনিটের সময় নিজ বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন। আবারও তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়িতে ভীড় জমতে লাগলো। আমি ও আমার স্ত্রী গিয়ে একনজর ভাই এবং ভাবীকে দেখে আসলাম। ভাই সন্তানদের বলেছিলেন আমার লাশ যেন কাটাকাটি করা না হয় আমাকে যেন সহজভাবে দাফন করা হয় ইত্যাদি। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে।

পরিশেষে 'আলোর পথ' ম্যাগাজিনে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখার আবেগ আমি সামলাতে পারলাম না বলেই আজকের এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ। তিনি দ্বীনের ঝাণ্ডাবাহী আমাদের এক প্রিয় ভাই ছিলেন বলে সবার কাছে তাঁর মাগফেরাতের দোয়া চেয়ে সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ ভাইটিকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁর পরিবারকে সাবরে জামিলের তৌফিক দিন।

লেখক: ওলামা এন্ড রিলেজিয়াস লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি, এমসিএ

সুহবার গুরুত্ব : নববী আদর্শ

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মাদ ইউনুছ

সুহবা শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, সঙ্গী, পৃষ্ঠপোষক। সাহাবা শব্দটি আমাদের পরিচিত। আমরা অহরহ রাসুল (সা.) এর সঙ্গীসাথীদের সাহাবা হিসেবে অভিহিত করে থাকি। সাহাবা এবং সুহবা– এ দুটো শব্দেরই উৎপত্তি এক জায়গায়। সুহবা বলতে নিয়মিত সঙ্গীদের বোঝানো হয়। যাদেরকে কালেভদ্রে বা বিশেষ সময়গুলোতে পাওয়া যায় তারা সুহবার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুহবা হলো এমন কেউ যে সবসময় আপনার পাশে থাকে। ঠিক এ কারণেই আরবি ভাষায় স্বামীকে স্ত্রীর জন্য সাহিব এবং স্ত্রীকে স্বামীর জন্য সাহিবা হিসেবে অভিহিত করা হয়। পাশাপাশি, প্রকৃত বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষককেই সুহবা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

সুহবা শব্দটি শুধুমাত্র ব্যক্তির সঙ্গী অর্থেই প্রয়োগ হয় না। নির্দিষ্ট একটি স্থানের বাসিন্দাকেও উক্ত স্থানের সঙ্গী বা সুহবা হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন কুরআনে জান্নাতের বাসিন্দাদের আসহাবুল জান্নাত এবং দোযখবাসীকে আসহাবুন নার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সুহবা বলতে কেবলই সান্নিধ্যকেই বোঝানো হয় না। বরং সুহবা হলো এমন কেউ যিনি তার বন্ধুকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করবেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, অর্থাৎ "তারা আমাদের থেকে নিরাপত্তা পাবে না।" (সুরা আম্বিয়া : ৪৩) ঠিক একইভাবে রাসুল (সা.) সফরে যাওয়ার আগে এই বলে দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا

"হে আল্লাহ আপনি এই সফরে আমার সঙ্গী (সুহবা) এবং আমার পরিবারের অভিভাবক। হে আল্লাহ আপনি আমাকে এই সফরে সান্নিধ্য প্রদান করুন এবং আমার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

তাই আমরা যখন সুহবা নিয়ে আলোচনা করবো তখন মনে রাখতে হবে যে, সুহবা মানে নিছক কোনো বন্ধুত্ব বা একসাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গী বা আড্ডাবাজির বন্ধুকে বোঝানো হয় না। কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা থেকে আমরা সুহবার যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাই সেগুলো হলো :

১. সুহবা অর্থ নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব। গোটা জীবনের জন্য দায়বদ্ধ থাকার মতো একটি সম্পর্ক।
২. এই বন্ধুত্ব কেবল এমন কারো সাথেই করা যাবে যিনি এর যোগ্য।
৩. সুহবা মানুষকে নিরাপত্তা দেয় এবং ক্ষতিকর সান্নিধ্য থেকে হেফাজত করে।
৪. সুহবা একজন মানুষকে সঠিক নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ সুহবা একইসাথে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করে।

সাহিব শব্দের বহুবচন হলো আসহাব। কুরআনে অসংখ্য স্থানে এই আসহাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: সাহিব আল হুত, আসহাবিল জান্নাতি, আসহাবুল কারইয়া, আসহাবাল ইয়ামিন, আসহাব আল আয়কাহ, আসহাব আল উখদুদ, আসহাব আল হিজর, আসহাবুস সাব্বাহ, আসহাবুল কাহাফ ইত্যাদি।

নেককার সুহবার গুরুত্ব:

এমন কারো সাথেই বন্ধুত্ব করা চাই যার আচারাদিকে আপনি বিশ্বাস করেন এবং যিনি মানুষ হিসেবেও প্রকাশ্যে এবং গোপনে আপনার কাছে বিশ্বস্ত। আল্লাহ পাক বলেন,

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, এমনকি যদি তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা আত্মীয় হয় তারপরও নয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে অদৃশ্য শক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমনই এক জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে

নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" (সুরা মুজাদিলাহ: ২২)

১. একজন নেককার সঙ্গী নিঃসঙ্গতা থেকে উত্তম আর নিঃসঙ্গতা অসৎ সান্নিধ্য থেকে উত্তম। একজন ভালো লেখক নীরব ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আর নীরব ব্যক্তি আবার অসৎ লেখক থেকে উত্তম। (ইবনে হিব্বান, রাওদাত আল উকালা : ৫৬)। একজন মানুষের জন্য কিছু সময় নিজের মতো করে একাকী আবার কিছু সময় উত্তম সান্নিধ্যে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিত। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেছেন, "আমি একাকীত্ব সম্বন্ধে যা জানি লোকজনও যদি তা জানতো তাহলে রাতের বেলা কেউ একা সফর করতো না।" (বুখারি : ২৯৯৮)। অন্যদিকে, আর-বিতে একটি প্রবাদ আছে যেখানে বলা হয়েছে, "পথ এবং গন্তব্য বেছে নেওয়ার আগে সঙ্গীকে বেছে নাও।"

২. উত্তম সঙ্গী বাছাই করার বিষয়ে ফার্সি ভাষাতেও একটি জনপ্রিয় প্রবাদ আছে। এতে বলা হয়, "উত্তম সঙ্গী তোমাকে উত্তম বানাবে আর অসৎ সঙ্গী তোমাকেও অসৎ বানিয়ে ছাড়বে।" এ কথা অনিবার্যভাবে সত্য যে, আমাদের জীবনের উপর আমাদের বন্ধু ও সঙ্গীদের বিস্তর প্রভাব থাকে।

৩. নেককার সান্নিধ্যে থাকা এবং অসৎ সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, "ভালো সঙ্গী আর মন্দ সঙ্গীর যে তফাত তার তুলনা হতে পারে একজন কস্তুরি বিক্রেতা এবং একজন কামারের মধ্যকার তফাতের সাথে। আপনি কস্তুরি বিক্রেতার কাছ থেকে কস্তুরি কিনেও সুগন্ধ অনুভব করতে পারেন আবার কস্তুরি না কিনে শুধুমাত্র তার কাছে গিয়েও সুগন্ধ অনুভব করতে পারেন। অন্যদিকে, যদি কামারের চুল্লির কাছে যান তাতে আপনার কাপড় পুড়ে যেতে পারে আপনার ঘর পুড়ে যেতে পারে আর কিছুই যদি না হয়, অন্তত একটি কুৎসিত পোড়া গন্ধ আপনার নাকে আসবেই।" (বুখারি : ২১২১)

৪. অনিষ্টকর সঙ্গী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। রাসুল (সা.) নিজেও এভাবে দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبّاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَاباً، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا.

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাই। এমন অসৎ দাম্পত্য সঙ্গী থেকে মুক্তি চাই যিনি আমাকে বয়সের আগেই বৃদ্ধ বানিয়ে দেবেন। এমন সন্তান থেকে পানাহ চাই যে একটি সময়ে আমার মনিব হতে চাইবে। এমন সম্পদ থেকে পানাহ চাই যা আমার জন্য শাস্তিমূলক বোঝা হয়ে যাবে। এবং এমন অসৎ সঙ্গী থেকে আশ্রয় চাই যে আমার ভেতর ভালো কিছু দেখলেও তা গোপন করে আর কোনো দোষ দেখলে তা অন্যদের বলে বেড়ায়।" (তাবরানি)

৫. আমাদের নিজেদের জন্য এবং সন্তানদের জন্য অবশ্যই নেককার সঙ্গী বাছাই করা প্রয়োজন। রাসুল (সা.) কে প্রায়ই সাহাবাগণ প্রশ্ন করতেন, আপনার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম কে? নবিজি (সা.) উত্তরে বলতেন, "যার আগমন তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথাবার্তা তোমার জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা মনে করিয়ে দেয়।" রাসুল (সা.) আরও বলেন, "প্রতিটি মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম ও আচারাদি অনুসরণ করে। তাই তোমরা কাকে বন্ধু হিসেবে বাছাই করছো সে বিষয়ে সচেতন থাকবে।" (আবু দাউদ : ৪৮৩৩)

একজন মানুষের ধর্ম ও দর্শনের উপর তার বন্ধুর কতটা প্রভাব থাকে আমরা তা রাসুলের (সা.) সিরাতের একাধিক ঘটনা থেকে জানতে পারি। উকবাহ বিন আবু মুইত ছিলেন কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তি। তিনি মুশরিক হওয়ার কারণে একবার রাসুল (সা.) তার দেওয়া খাবার খাননি। তৎকালীন আরবে কেউ কারো দেওয়া খাবার না খেলে এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিব্রত হতেন। তাই নবিজি (সা.) কে খাওয়ানোর জন্য তিনি কৌশল হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে উকবাহ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু উবাই বিন খালাফ মক্কার বাইরে ছিলেন। উবাই মক্কায় ফিরে আসার পর উকবাহ'র ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে অবগত হন। উবাই তখন তার বন্ধু উকবাহকে একটি আল্টিমেটাম দেন। উবাই তখন জানান, যদি উকবাহ তাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই ইসলাম ত্যাগ করতে হবে। উকবাহ বন্ধুত্বকে অগ্রাধিকার দেন এবং বন্ধুত্বের স্বার্থে ইসলাম ত্যাগ করেন। এমনকি তিনি নবিজি (সা.) এর মুখ মোবারক উদ্দেশ্য করে থুথু নিক্ষেপ করেন। যদিও থুথু নিক্ষেপের সাথে সাথে তার মুখের একাংশই জ্বলে যায়। উকবাহ নিহত হন বদরের যুদ্ধে। আর উবাই নিহত হন ওহুদ যুদ্ধের সময়। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুজনের বন্ধুত্ব সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.

"জালেম সেদিন আপন হাতদুটো কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।" (সুরা ফুরকান: ২৭-২৮)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়।"

(সুরা যখরুফ : ৬৭)

রাসুল (সা.) এর চাচা আবু তালিবের কথাও ভাবতে পারেন। রাসুল (সা.) এর প্রতি তার প্রচণ্ড স্নেহ ছিল আর রাসুলও (সা.) খুব করে চেয়েছিলেন যাতে চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু তালিব শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে, সিরাহ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আবু তালিব ইসলাম গ্রহণের সাহস পাননি কারণ তিনি তার বন্ধুত্ব হারানোর আশঙ্কা করেছিলেন। কারণ তৎকালীন আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই তার বন্ধু ছিলেন।

বিপরীতে, কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহফের সাথে থাকা কুকুরটির কথা ভাবা যায়। যদিও এই প্রাণিটির নিজস্ব কোনো বিশ্বাস এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখেনি। শুধুমাত্র ধার্মিক ব্যক্তিদের সাথে থাকার কারণে, কুরআন সুরা আল-কাহফে এ ঘটনাকে এবং এ কুকুরটিকে অমর করে রেখেছে। উপরন্তু, রাসুল (সা.) একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে কুকুরটি তার উত্তম সঙ্গীদের সাথে জান্নাতে থাকবে। (তাফসিরে মুকাতিল খ. সুলায়মান) এ ঘটনা সাহচর্যের গভীর প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করে। একটি নেতিবাচক সুহবা কাউকে সাহাবির মর্যাদা থেকে সরাসরি কুফরের দিকে নিয়ে যায়, আবার অন্য একজনকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাঁধা দেয় এবং উভয়ের জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত করে। আর ধার্মিক সুহবা একটি প্রাণির মর্যাদাকে এতটাই উচ্চমানে উন্নীত করেছে যে তার জন্য জান্নাতও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

রাসুল (সা.) এবং সাহাবিদের জীবনীর আলোকে সুহবা:

সুহবা কীভাবে একজন মানুষকে সঙ্গ দেয় এবং ভালোবাসা ও দায়িত্বানুভূতির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, রাসুল (সা.)-এর সিরাহ থেকে এ সম্পর্কে সুধারণা পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসুল (সা.) যোগাযোগ, দিক নির্দেশনা প্রদান এবং পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি উন্নয়নের পথ সুগম করেছেন। বিভিন্ন চিন্তার মানুষের সাথে উন্নত সম্পর্ক তার যোগাযোগ পারদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। তাঁর সঙ্গী তথা সাহাবাদের তিনি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে তারা একীভূত একটি সম্প্রদায় হিসেবে বিরাজ করেছিলেন এবং সমচিন্তা, সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণা লালন করতে পেরেছিলেন। রাসুল (সা.) একজন অভিভাবক হিসেবে কতটা তৎপর ছিলেন, উন্নত ছিলেন তার প্রমাণ মিলে তার চাচাতো ভাই ও মেয়ে জামাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর সাথে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। হযরত আলী (রা.) সরাসরি নবিজি (সা.) এর জীবন ও চরিত্র থেকে শিখেছেন এবং তাঁর জীবনে ও কর্মে তা প্রয়োগ করেছেন। শুধু তাই নয়, সরাসরি নবিজি (সা.) এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় আলী (রা.) ইসলামের দর্শন ও ফিকাহের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে যেতে পেরেছিলেন।

সাহবা/সুহবা: ইসলামী প্রেক্ষাপট:

সুহবা অর্থ সঙ্গ দেওয়া। আর রাসুল (সা.) এর সঙ্গী যারা ছিলেন তাদের বলা হয় সাহাবি। সাহাবাগণ হলো প্রথম যুগের মুসলিম, যারা সরাসরি রাসুল (সা.) এর কাছ থেকে শিখেছেন। সাহাবাগণ হলেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং ইসলামের ইতিহাসের সর্বাধিক ধার্মিক প্রজন্ম। সঙ্গী সবসময় নেককার মানুষগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করা উচিত যাতে উত্তম সান্নিধ্যের প্রভাবে ব্যক্তি চরিত্র আরও বেশি উন্নত হয়।

ব্যক্তিগত সুহবা : কিছু দৃষ্টান্ত

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এর কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করা রাসুলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বললেন, আমার জন্য কুরআন তেলাওয়াত কর। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি কিভাবে আপনার সামনে তেলাওয়াত করব যেখানে কুরআন আপনার ওপর নাজিল হয়েছে।" রাসুল (সা.) বললেন, হ্যাঁ পড়ো কারণ আমি অন্যদের কাছ থেকে কুরআন শুনতে পছন্দ করি।" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, আমি তখন সুরা নিসা তেলাওয়াত করলাম যতক্ষণ না আমি এই আয়াতে এলাম– "তাহলে কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী আনব এবং আপনাকে (হে মুহাম্মদ) সেই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আনব?" (আন-নিসা ৪:৪১) এ পর্যন্ত তেলাওয়াতের পর রাসুল (সা.) বললেন, "আর পড়তে হবে না, এখানেই থামো।" আমি দেখলাম তাঁর চোখ পানিতে ছলছল করছে। (বুখারি ও মুসলিম)

কিছু কবির প্রশংসাও সত্যনিষ্ঠ হয়:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আরব কবিদের সবচেয়ে সত্য কথা যে বলেছে তার নাম লাবিদ। সে বলেছে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই নিস্ফল।' (মুসলিম: ২২৫৬)

রাসুল (সা.) হাসসান বিন সাবিতকে (রা.) অনুমতি দিয়েছিলেন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বিন সাবিতকে দ্বীন ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে নবিজি (সা.) আক্রমণের কৌশল হিসেবে কবিতা ব্যবহার শুরু করেননি। হাসসান বিন সাবিতকে (রা.) পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে কবিতা লেখার জন্য তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সাহাবি কবিটি নবিজি (সা.) এর ভাবমূর্তি রক্ষায় কবিতা লিখতেন। হাসসান রাসুল (সা.) এর কবি হয়েছিলেন। মহানবি (সা.)-এর সম্মান রক্ষা এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি মুসলমানদের হৃদয় ও মননে বিশেষ স্থানও অধিকার করেছিলেন।

হযরত আলী (রা.) কে প্রশিক্ষণ দেওয়া:

নবিজি (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তার চাচাতো ভাই আলী (রা.) খুব দ্রুত পরিণত হয়ে ওঠেন। নবিজি (সা.) এর সঙ্গ ও দিকনির্দেশনা এতই গভীর ছিল যে আলী (রা.) নবিজি (সা.) এর প্রায় সবগুলো বৈশিষ্ট্য একই শিরায় ধারণ করেছিলেন। প্রখ্যাত তাবেঈ আবুল আসওয়াদ বলেন, 'আমরা যখন আলীর চেহারা দেখতাম, তখন মনে হতো, নবিজি (সা.) এর ব্যক্তিত্ব তাঁর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতো। মনে হতো, যেন আমরা নবিজি (সা.) এর চেহারা দেখেছি।' সীরাহর বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন যে আলী অন্যদের তুলনায় দীর্ঘ সময় ধরে নবিজি (সা.) এর পরামর্শের

অধীনে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই পরামর্শের ফল ছিল গভীর। তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই একজন যোগ্য পণ্ডি ত হয়ে ওঠেন এবং শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হয়ে ওঠেন।' আলী (রা.) এর পূর্ববর্তী তিন খলিফার যুগে, তিনি আইনগত সমস্যা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সবচেয়ে সম্মানিত এবং অপরিহার্য পরামর্শদাতা ছিলেন। তবে যুদ্ধ বা রাজনীতিতেই তার পারদর্শিতা সীমাবদ্ধ ছিলেন না। আলী (রা.) একজন মুসলিম স্বামী এবং পিতার আদর্শ মডেল এবং মডেল একটি পরিবারের সংগঠক। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে আলী (রা.) যখন শিশু ছিলেন তখন তিনি নবিজি (সা.) কে দেখার এবং তাঁর সাথে চলাফেরার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার অনেকে এমনও বলতে পারে যে, হযরত আলী (রা.) এর বয়স কম থাকায় তাকে বিশ্বাস করানো এবং লালনপালন করা হয়তো নবিজি (সা.) এর সহজ ছিল। বিকল্প হিসেবে আমরা আবু বকর (রা.)এর উদ-াহরণ দিতে পারি, যিনি পরিণত ছিলেন এবং বয়সে তিনি প্রায় নবিজি (সা.) এর একই বয়সের ছিলেন (নবিজি (সা.) এর চেয়ে মাত্র দুই বছরের ছোট)। অথচ মুহাম্মাদ (সা.) এর সাহচর্য তার জীবনকে বদলে দিয়েছিল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আলী (রা.) এবং আবু বকর (রা.) দুজনেই নবিজি (সা.) কে ভালোবাসার জায়গা থেকে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন। যে রাতে নবিজি (সা.) মদিনায় হিযরত করেন, সেখানে নিশ্চিত মৃত্যু হতে পারে জেনেও আলী (রা.) সারা রাত নবিজি (সা.) এর বিছানায় শুয়েছিলেন। অন্যদিকে, আবু বকর (রা.) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিজরতের সময় সাওর পর্বতের গুহায় নবিজি (সা.) এর সাথে ছিলেন। এগুলো সবই হলো আন্তরিক সান্নিধ্যের শক্তি যা একজন নেককার সঙ্গীর স্বার্থে যে কোনো ঝুঁকি নেওয়ার সাহস তৈরি করে দেয়।

বিয়ের জন্য কণে দেখার জন্য নবির আদেশ:

মুগীরা ইবনু শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক মহিলার নিকট বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাকে দেখে নাও, তোমাদের মধ্যে এটা ভালোবাস-ার সৃষ্টি করবে। (তিরমিজি : ১০৮৭) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, জাবির, আবু হুমাইদ, আনাস ও আবু হুরাইরা (রা.) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, বিয়ে করার পূর্বে নিষিদ্ধ অঙ্গের প্রতি না তাকিয়ে শুধুমাত্র পাত্রী দেখাতে কোনো সমস্যা নেই। এই মত ইমাম আহমাদ ও ইসহাকেরও। আর হাদিসে উল্লেখিত 'তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে' এ কথার অর্থ হলো, পাত্রীকে দেখে পছন্দ করার পর বিয়ে করলে দাম্পত্য জী-বনের ভালোবাসা স্থায়ী হয়।

পুরুষেরা অবশ্যই নারীদের সম্মান করবে; তাদের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে না

ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। আল-ফাদল একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সওয়ার ছিলেন। তখন খাশাম গোত্রের এক মহিলা এসেছিলেন। আল-ফাদল তার দিকে তাকাতে শুরু করল এবং সে তার দিকে তাকিয়েই রইল। এ দৃশ্য দেখে নবিজি (সা.) আল-ফাদলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। (বুখারি ১৪৪২, মুসলিম ১৩৩৪)

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া:

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে রাসুল (সা.) কে বললেন, আমার মা গত হয়েছেন। তবে যদি তিনি কথা বলতে পারতেন, তিনি হয়তো কিছু দান-সদাকা করতেন। এখন তিনি যেহেতু নেই, আমি যদি তার নামে কিছু দান করি তাহলে কি তিনি তার নেকি পাবেন? রাসুল (সা.) বললেন, হ্যাঁ। (বুখারি)। আমরা আমাদের মরহুম বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করতে পারি যেন তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাদেরকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়। মরহুম বাবা-মায়ের জন্য উমরা এবং হজও আদায় করা যায়। রাসুল (সা.) বললেন, "একজন ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে উন্নীত করা হবে। তিনি এর কারণ বুঝতে পারবেন না। তাই তিনি জানতে চাইবেন, কেনোই বা তার অবস্থান উন্নীত হলো? তাকে বলা হবে, কারণ তোমার সন্তানেরা তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেছে।" (ইবনে মাজাহ)

হুজাইফার (রা.) অবস্থানকে সম্মান করা:

মদিনায় হিজরতের পর হুজায়ফা (রা.) নবিজি (সা.) এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান। তিনি বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধে অংশ নেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি এবং আমার পিতা তখন মদিনার বাইরে ছিলাম। নতুবা আমরা কখনোই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতাম না। আমরা বদরের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মদিনায় আসছিলাম। কিন্তু তখনই অবিশ্বাসী কুরাই-শরা আমাদের পাকড়াও করে এবং জিজ্ঞাসা করে যে আমরা কোথ ায় যাচ্ছি। আমরা তাদের বলেছিলাম– আমরা মদিনায় যাচ্ছি। তারা পাল্টা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, মুহাম্মাদের (সা.) সাথে দেখা করার কোনো পরিকল্পনা আমাদের আছে কিনা। আমরা জোর দিয়ে তখন বলেছিলাম যে আমরা কেবল মদিনাতেই যেতে চাই এর বেশি কিছু নয়। তারা আমাদের কাছ থেকে এই মমে© প্রতি-শ্রুতি পাওয়ার পরেই আমাদের ছেড়ে দেয় যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ (সা.) কে সাহায্য করবো না এবং তাদের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধে লিপ্ত হবো না।" পরবর্তী ঘটনা পরিক্রমার বর্ণনা দিতে গিয়ে হুজাইফা (রা.) বলেন, "যখন আমরা নবিজি (সা.) এর কাছে এলাম, আমরা তাকে কুরাইশদেরকে দেওয়া আমাদের প্রতি-শ্রুতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের এখন কি করা উচিত।" তিনি উত্তরে বললেন যে, "এই প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করা উচিত এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা উচিত।"

হুজাইফা (রা.) তাঁর পিতাসহ সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় হুজাইফা (রা.) এর উপর নানা ধরনের চাপ ছিল কিন্তু তিনি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর বাবার সাথে ভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। উহুদের যুদ্ধের আগেই, নবিজি (সা.) হুজাইফা (রা.) এর পিতা আল-

ইয়ামান (রা.) এবং সাবিত ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) কে অন্যান্য নারী ও শিশুসহ বেসামরিক নাগরিকদের সাথে রেখে যান। এর কারণ ছিল তারা দুজনেই ছিলেন বেশ বৃদ্ধ।। যুদ্ধ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে আল-ইয়ামান (রা.) তার বন্ধুকে বললেন, "আমাদের কারোই তো বাবা-মা নেই। তেমন কোনো পিছুটানও নেই। তাহলে আমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? আমাদের দুজনেরই হায়াতে হয়তো খুব বেশি সময়ও নেই। তাহলে আমরা কেন রাসুল (সা.) এর বাহিনীতে শরীক হয়ে শহীদ হওয়ার সুযোগ নেবো না?" তারা দুজনেই এ চিন্তার সাথে একমত হলেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং ময়দানে চলে গেলেন। অল্প সময়ের ভেতর সাবিত ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) মুশরিকদের হাতে শাহদাত লাভ করেন। কিন্তু আল ইয়ামান (রা.) সেই সুযোগ পাননি। মুসলিমদের একটি গ্রুপ বরং তাকে পাকড়াও করে। কারণ আল ইয়ামান (রা.) কে তারা চিনতে পারেননি। তিনি মুশরিক নাকি মুসলিম তাও তারা বুঝতে পারেনি। তখন হুজাইফা (রা.) সেখানে চলে আসেন এবং সবার সামনে ঘোষণা দিলেন, "আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি আমার পিতা!"

ব্যক্তিগত দায়িত্বঃ

কুরআনের আয়াত লেখার জন্য মুহাম্মাদ (সা.) যাদের নির্বাচিত করেছিলেন, হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.) ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি বেশিরভাগ সময় কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাজিল হওয়া আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে থাকতেন। জায়েদ ইবনে সাবিত ১৩ বছর বয়সে হিব্রু এবং সিরিয়ান ভাষা শিখেছিলেন। তিনি একজন দোভাষী এবং লেখক হিসেবেও নবিজি (সা.) এর সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

পরিবারের সদস্যদের জন্য সুহবা

সূর্যোদয়ের পর পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ

সূর্যোদয়ের পর নবিজি (সা.) ঘরে ফিরে আসতেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার সময় বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক খাইরাল মাউলাজি, ওয়া খাইরাল মাখরাজি; বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা; ওয়া আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। আপনার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করি। (আবু দাউদ : ৫০৯৬)। ঘরের ভেতর ঢুকেই তিনি মিসওয়াক করতেন, পরিবারের সবাইকে সালাম দিতেন, তার স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন। তাদের খোঁজ নিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। ঘরে কোনো খাবার থাকলে তিনি খেয়ে নিতেন আর না থাকলে তিনি রোজা রাখতেন।

পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক

আসরের নামাজের পর নবিজি (সা.) মসজিদ থেকে বেরিয়ে তাঁর সব স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং সেদিন যার পালা তার বাসায় স্থির হতেন। তিনি অনেক সময় পরিবারের সব সদস্য বিশেষ করে স্ত্রীদের একটি জায়গায় সমবেত করে তাদের সাথে কথা বলতেন, দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করতেন। স্ত্রীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। এভাবে পারিবারিক আবহে নবিজি (সা.) এর ঘরটি একটি দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রে রূপ নিয়েছিল।

রাতের খাবার গ্রহণ

নবিজি (সা.) এর খাবার সবসময় মেঝেতে পরিবেশন করা হতো। তিনি কখনোই টেবিলে বসে খেতেন না। যখন তাঁর কাছে খাবার আনা হতো তখন তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলতেন এবং থালার যে অংশটি তাঁর নিকটবর্তী সেখান থেকে খাবার নিয়ে খেতেন। তিনি তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন। তাঁর সামনে যে খাবার ছিল তা নিয়ে তিনি কখনোই অভিযোগ করেননি। আবার এমনও হয়নি যে একটি খাবার পছন্দ হয়েছে বলে অনেক খেয়েছেন আবার একটি খাবার কম পছন্দের হওয়ার কারণে একদমই প্রত্যাখান করেছেন।

যখন তিনি তার স্ত্রীদের কোনো একজনের সাথে খেতেন, তখন তিনি তার জন্য অনেকটা সময় বরাদ্দ করতেন। এমনও হয়েছে, এই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে তার স্ত্রীকে খাইয়ে দিতেন বা তাঁর স্ত্রী যে অংশ থেকে খেয়েছেন, সেই অংশ থেকে তিনি নিজেও খেয়েছেন। আবার যখন সাহাবাদের সাথে খেতে বসতেন তখনও সেই আহারটি মনোরম কথোপকথন ছাড়া কিংবা তাদের আচার-ব্যবহার শেখানো বা জ্ঞান প্রদান না করা ছাড়া কখনোই সম্পন্ন হয়নি। খাবার গ্রহণের পর নবিজি (সা.) তাঁর আঙ্গুল চাটতেন এবং তাঁকে দেওয়া খাবারের জন্য রবের প্রশংসা করতেন এবং পরিশেষে মুখ ধুয়ে নিতেন।

পরিবারের জন্য বেশি সময়

রাসুল (সা.) তাঁর ঘরে ফিরে ইশার নামাজের পর দুই রাকাত সুন্নত আদায় করতেন। এরপরে, তিনি তাঁর পরিবারের সাথে কথা বলতে এবং তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেই বেশি পছন্দ করতেন।

শয্যাগ্রহণ :

যখন তিনি চূড়ান্তভাবে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তিনি ঘুমের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। তাঁর জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখতেন এবং তাঁর স্ত্রীর সাথে বিছানায় গিয়ে একটি কম্বল এবং একটি বালিশ ভাগ করে নিতেন। তাঁর বিছানা ছিল তন্তুতে ভরা পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি এবং তাঁর বালিশটি একই ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি ছিল। তিনি তাঁর মিসওয়াকটি তাঁর মাথার কাছে রাখতেন যাতে তিনি ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথেই এটি ব্যবহার করতে পারেন। তিনি ডান দিকে ফিরে শুতেন, ডান গালের নিচে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ার আগে জিকির পাঠ করতেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন এবং ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাঁর সাথে অনেক সময় কাটাতেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং যখন তিনি ঘুমের মধ্যে এপাশ ওপাশ করতেন, তখনও তাকে বিশেষ ধরনের জিকির করতে শোনা যেতো।

বিতরের নামাজ : তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিতরের নামাজে শরীক হওয়ার জন্য জাগিয়ে দিতেন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যরাত থেকে রাতের মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ বাকি থাকা পর্যন্ত নামাজ, দু'আ, তাস-বিহ, তেলাওয়াত, রুকু ও সিজদা এই অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিতরের নামাজে শরীক হওয়ার জন্য জাগাতেন এবং তারা একসাথে বিতর আদায় করতেন। কখনও কখনও নবি-জি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যরাত ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর বাড়ি থেকে বের হতেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার জন্য বাকী নামক কবরস্থানে যেতেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি এ কাজটি বেশি করতেন।

নিজের জন্য সুহবা : যেভাবে স্বস্তি পেতে পারেন মধ্যরাত থেকে ফজর পর্যন্ত রাত্রি যখন মধ্যরাত্রিতে পৌঁছায়, তখন নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠে বসেন, তাঁর বরকতময় মুখ থেকে ঘুম মুছে নিতেন, মিসওয়াক দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে সুরা আল ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পড়তেন। তারপর তিনি উঠে, ওজু করে, পোশ-াক পরে এবং তাঁর রাতের নামাজ শুরু করতেন, হয় বাড়িতে বা মসজিদে।

রাতের নামাজ আদায় করা

রাতের সালাত আদায় করার আগে, তিনি মাঝে মাঝে আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা করতেন, তাঁর প্রথম দুই রাকাত ছিল বেশ হালকা এবং সংক্ষিপ্ত, তারপরে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাতে সালাত আদায় করতে দেখলে মনে হতো তিনি সত্যিই অন্য জগতে নিমগ্ন এবং নামাজ শেষ করার কোনো তাড়া তাঁর নেই। তিনি শত শত আয়াত পাঠ করতেন। এর মধ্যে যখন তিনি রহমত সংক্রান্ত একটি আয়াত পাঠ করতেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর রহমতের জন্য প্রার্থনা করতেন। আবার যদি তিনি শাস্তি বিষয়ক কোনো আয়াত তেলাওয়াত করতেন তাহলে তিনি শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন। শুধু তাঁর তিলাওয়াতই দীর্ঘ ছিল না, তাঁর রুকু-সিজদাও দীর্ঘ ছিল।

সুহবা, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশিক্ষণ: ইসলামী সংগঠনের জন্য শিক্ষা

আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে সুহবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করা। রাসুল (সা.) যেভাবে মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর সান্নিধ্যের বরকতও অনুধাবন করতে পারি। উদা-হরণ হিসেবে বলা যায়, "কোন আচরণটি উত্তম কিংবা ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? এরকম প্রশ্ন প্রায়ই সাহাবাগণ নবিজি (সা.) কে জিজ্ঞেস করতেন। আর রাসুল (সা.) পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে এসব প্রশ্নের মানানসই উত্তর প্রদান করতেন। যেমন, বুখারিতে সংকলিত এমন একটি হাদিসে দেখা যায়, 'আইনুল ইসলামি খাইর বা ইসলামের কোন শিষ্টাচা-রটি সর্বোত্তম প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (সা.) বলেছেন, "পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষকে খাওয়ানো, তাদেরকে সালাম প্রদান করা।' আবার সহিহ মুসলিমে সংকলিত আরেকটি হাদিসে একই প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ঐ মুসলিম ব্যক্তিই উত্তম যার কথা ও হাত থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদে থাকে।' আবার বুখারি ও মুসলিম উভয় হাদিসগ্রন্থে সংকলিত হাদিসে রাসুল (সা.) ভিন্ন কিছু বলেছেন। এক্ষেত্রে উত্তম শিষ্টাচারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ আদায় করা। এরপর, পিতামাতার সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করা। আর তারপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" বর্ণনাকারী সাহাবি এমনও বলেছেন, "আমি যদি তাকে এরপরও প্রশ্ন করতাম, তিনিও হয়তো তার উত্তর দেওয়া অব্যাহত রাখতেন।"

রাসুল (সা.) কেন একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছিলেন? হাদিস বিশারদগণের মতে, নবিজি (সা.) এমনটা করতেন কারণ তিনি সাহাবিদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যার ব্যাপারে তাঁর আশঙ্কা হতো যে, লোকটি গীবতে ব্যস্ত হয়ে যেতে পারে তাকে তিনি জিহবা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেই তাগিদ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত ***প্রথম হাদিসটি বিবেচ্য। আবার*** অপর একজন হয়তো সামর্থ্য থাকা স্বত্ত্বেও প্রত্যাশিত মাত্রায় অপরকে খাওয়াতেন না কিংবা সালাম দেওয়ায় একটু কম অনুশীলন করতেন। এমন কারো বেলায় তিনি এ দুটো কাজ করার উৎসাহ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় হাদিসটি বিবেচ্য। অন্যদিকে, যাদের নিয়ে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে তারা ফরজ নামাজে অবহেলা করতে পারে, পিতামাতাকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন কিংবা জিহাদের ডাক আসলে বিরত থাকতে পারে তাদের বেলায় তিনি তৃতীয় হাদিসটির পরামর্শগুলো প্রদান করেছেন।

আমার মনে হয়, আমাদের অধিকাংশের বেলায় যদি কেউ একই প্রশ্ন বারবার করতো তাহলে আমরা বলতাম, "আপনি একই প্রশ্ন কেন একাধিকবার করছেন? অথবা হয়তো বলতাম, আমি অমুক দিনে অমুককে যা বলেছি তা কি আপনি শুনেননি? আবারও কেন একই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন? কিন্তু নবিজি (সা.) কখনোই এমনটা বলেননি। তাকে একই প্রশ্ন অসংখ্যবার করা হলেও তিনি বিব্রতবোধ করেননি। বরং তিনি প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তরই অত্যন্ত সাবলীলভাবে ও মানবিকতার সাথে প্রদান করেছেন। আর এভ-াবেই রাসুল (সা.) তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব তৈরি করতেন। যার পরিণতিতে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমরাও যদি এরকম উন্নত কোনো সভ্যতা বিনির্মাণ করতে চাই, আমাদেরও একই দৃষ্টিভঙ্গি লালনের চেষ্টা করতে হবে।

রাসুল (সা.) প্রত্যেকের মেধা ও সম্ভাবনা বুঝতে পারতেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আবার ব্যবহারিক জীবনে তার উন্নত পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োগও করতেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। তাঁর চাচাতো ভাই ও মেয়ে জামাই হযরত আলী (রা.) এর উৎ-কৃষ্ট উদাহরণ। হযরত আলী (রা.) চমৎকার কবিতা লিখতে পারতেন। নবিজি (সা.) অসংখ্যবার আলী (রা.) কে ডেকে তার কবিতা শুনেছেন। কিন্তু যখন কুরাইশ কিছু কবি ইসলাম ও নবিজি (সা.) এর বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখলো, তখন সাহাবাগণ নবিজি (সা.) কে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি আলী (রা.)

কে দিয়ে এর বিপরীত কবিতা রচনা করিয়ে নেন। রাসুল (সা.) অবশ্য তাদেরকে বলেছিলেন, আলী (রা.) এ কাজের জন্য যথাযথ ব্যক্তি নয়। তিনি পরবর্তীতে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সাহাবা কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.) কে। এ সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণটাও অনুধাবন করা জরুরি। নবিজি (সা.) হযরত আলী (রা.) এর কাব্যিক দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কারণ কুরাইশদের নোংরা প্রচারণার বিরুদ্ধে যে ভাষায় জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, হযরত আলী (রা.) ঐ ধরনের কবি ছিলেন না। তাঁর লেখার ধরন ছিল অনেকটাই অভিজাত। এ কারণে অপপ্রচারের উত্তর দেওয়ার জন্য রাসুল (সা.) হাসসান বিন সাবিত (রা.) তে যথাযথ মনে করেছিলেন।

নবিজি (সা.) কখনোই যুদ্ধক্ষেত্রে হাসসান বিন সাবিতকে (রা.) কোনো দায়িত্ব দেননি। নবিজি (সা.) তাকে কলমযোদ্ধা হিসেবেই কাজে লাগিয়েছিলেন, প্রকৃত যোদ্ধা হিসেবে নয়। তাই হাসসান বিন সাবিতকে (রা.) ময়দানে না নিয়ে দেখা যেতো শিশু ও নারীদের পাহারা দেওয়ার কাজেই রাসুল (সা.) তাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে, রাসুল (সা.) প্রতিটি যুদ্ধে আলী (রা.) কে সেনাপতির দায়িত্ব দিতেন। পতাকা বহনের দায়িত্ব দিতেন। কারণ তিনি জানতেন, আলী (রা.) কলম ও তলোয়ার– দুটোক্ষেত্রেই সাহসী একজন যোদ্ধা।

অন্যদিকে, নবিজি (সা.) কখনোই যুদ্ধক্ষেত্রে হাসসান বিন সাবিতকে (রা.) কোনো দায়িত্ব দেননি। নবিজি (সা.) তাকে কলমযোদ্ধা হিসেবেই কাজে লাগিয়েছিলেন, প্রকৃত যোদ্ধা হিসেবে নয়। তাই হাসসান বিন সাবিতকে (রা.) ময়দানে না নিয়ে দেখা যেতো শিশু ও নারীদের পাহারা দেওয়ার কাজেই রাসুল (সা.) তাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে, রাসুল (সা.) প্রতিটি যুদ্ধে আলী (রা.) কে সেনাপতির দায়িত্ব দিতেন। পতাকা বহনের দায়িত্ব দিতেন। কারণ তিনি জানতেন, আলী (রা.) কলম ও তলোয়ার– দুটোক্ষেত্রেই সাহসী একজন যোদ্ধা।

প্রতিটি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনা এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করার ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামিক সংগঠনগুলোর বিশেষ করে, তাদের সদস্যদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য পরামর্শ দেওয়ার সময় কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তিকে কাজ ও দায়িত্ব অর্পণ করার সময় এই বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কল্যাণকর সুহবা অনুশীলনের কিছু টিপস

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে, আমরা এমন বেশ কিছু টিপস সনাক্ত করতে পারি যার মাধ্যমে একটি কল্যাণকর সুহবা বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে:

- নিয়ত পরিশুদ্ধ রাখা : আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি সুহবা প্রতিষ্ঠা করবেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আপনি সম্পর্কগুলো বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের চর্চা করবেন।
- উপযুক্ততা নির্ধারণ করুন : আপনি যে ব্যক্তির কাছ থেকে সুহবা গ্রহণ করছেন তিনি তার উপযুক্ত কিনা এবং আপনি যাকে সুহবা দিচ্ছেন তিনি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তা গ্রহণ করার যোগ্য কিনা তা মূল্যায়ন করুন।
- জানাশোনা ও বোঝাপড়া : সাহচর্য দেওয়ার আগে, আপনি যাকে সঙ্গ অফার করছেন তাকে বুঝতে সময় নিন। তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, প্রত্যাশা এবং কোথায় তিনি সবচেয়ে বেশি মানানসই হবে– তা বিবেচনা করুন।
- উত্তম শিষ্টাচার : আপনার বন্ধু, সহকর্মী এবং সমমনা মানুষগুলোর সাথে উত্তম ব্যবহার করুন। কারণ রাসুল (সা.) মানুষের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উত্তম চরিত্রকেই সর্বা-

ধিক এগিয়ে রেখেছেন।

- ইতিবাচক মতামত দেওয়ার চেষ্টা করুন : উত্তম শিষ্টাচারের অন্যতম নিদর্শন হলো মানুষের ত্রুটি দেখার পরও তার সাথে ভালো ব্যবহার করা। রাসুল (সা.) বলেছেন, "প্রকৃত মুমিনেরা তার দ্বীনি ভাই বোনদের দোষ বা ভুল ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। আর যারা মুনাফিক তারা অপরের দোষটাই আগে দেখে।" (ইবনে মাজাহ) অন্যদিকে, হামদুন আল কাসসার (রহ.) বলেন, "যদি তোমাদের কোনো ভাই ভুল করে ফেলে, তাহলে অন্তত ৯০টি কারণ বা যুক্তি বের করবে যার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া যায়। আর যদি কাউকে ক্ষমা করার চেষ্টা করতেই না পারো অথবা ক্ষমা করার মতো কোনো কারণ যদি তোমার চোখে ধরা না পড়ে তাহলে বুঝবে, প্রকৃত অপরাধী তুমি নিজেই।"
- ভুল অগ্রাহ্য করা : উত্তম আচরণের আরেকটি নিদর্শন হলো অপরের দোষগুলোকে অগ্রাহ্য করা এবং অহেতুক দোষারোপের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসা। ফুদাইল ইবনে আইয়াদ (ইন্তেকাল ১৮৭ হিজরি) বলেন, "প্রকৃত সাহসিকতা হলো ভাইদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা।" ইবনে আল-আরাবি (ইন্তেকাল ২৩১ হিজরি) বলেছেন, "ভাইদের কারণে যে ক্ষতি সাধন হয় তা ভুলে যেতে পারলে তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা উল্টো আরও বৃদ্ধি পাবে।" এ কারণে প্রকৃত মুমিনদের দায়িত্ব হলো, পার্থিব মোহতে আক্রান্ত লোকদের এড়িয়ে যাওয়া কারণ এটি আপনাকেও মোহবিষ্ট করে তুলবে এবং টেনে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে নিম্নমুখী গমন মানুষকে আল্লাহর গোলামি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে, বান্দা আগের মতো তাকওয়াবান ও সজাগ থাকতে পারবে না। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে মুমিন বান্দাকে অবশ্যই আখেরাতমুখী মানুষের সাহচর্য লাভের চেষ্টা করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে জুননুন (ইন্তেকাল ২৪৫ হিজরি) একবার একজনকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "এমন কোনো ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকা উচিত যার কাছে আপনি অন্তত বাহ্যিকভাবে নিরাপদ। এমন কাউকে সঙ্গী বানানোর চেষ্টা করুন যে আপনাকে সবসময় ভালো কাজের পরামর্শ দিবে এবং আপনাকে রবের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে।"
- ভাইদের সাথে মিলেমিশে থাকুন : ভাইদের সাথে খুব বেশি তর্কে ও বিবাদে জড়াবেন না। বরং আপনার বিবেক ও হিকমত সায় দিচ্ছে এবং শরীয়াত অনুমোদন দিয়েছে, এমন সব বিষয়ে তাদের সাথে একমত হওয়ার চেষ্টা করুন। আবু উসমান বলেন, "ভাইদের জন্য দুঃখবোধ করার চেয়ে তাদের সাথে একমত হওয়া উত্তম।"
- সম্মানিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকুন : এমন ব্যক্তিদের সাথে থাকুন যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে এবং যারা সচেতনভাবে শরীয়াতবিরোধী কোনো কাজ করেন না। আলী (রা.) বলেন, "যদি তোমরা নিজেদের ভেতর লজ্জাবোধ জাগিয়ে তুলতে চাও তাহলে তাদের সামনে বসো যাদের ভেতরও লজ্জাবোধ সক্রিয় রয়েছে।" অন্যদিকে, ইমাম আহমান বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, "আমি নিজে কখনোই দুর্ভাগ্যের মধ্যে পতিত হইনি যে পর্যন্ত না আমি এমন কারো সান্নিধ্যে গিয়েছি যাদের ভেতর কোনো লজ্জাবোধ নেই।"
- প্রফুল্লতা প্রদর্শন করুন : মুখে উচ্ছলতা ও প্রফুল্লতা ধরে রাখুন, জিহবায় থাকুক মায়া, অন্তরে চাই বিশালতা, মানুষের প্রতি থাকুক সহানুভূতি ও দরদ ভরা হাত আর সর্বোপরি রাগ, ক্রোধ ও অহংকার থাকুক নিয়ন্ত্রণে। মানুষের জন্য অন্তরে সম্মান পোষণ করুন এবং তাদের সান্নিধ্যে আনন্দ, স্বস্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ লালন করুন।
- জ্ঞানীদের সান্নিধ্যে থাকুন : প্রকৃত উত্তম সঙ্গী হলো জ্ঞানী, মৃদুভাষী, বুদ্ধিমান এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। জুননুন (রহ.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কাউকেই বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উত্তম পোশাক দিয়ে আবৃত করেননি, জ্ঞানের চেয়ে উত্তম মালা পরিয়ে দেননি এবং ভদ্রতার চেয়ে উত্তম কিছু দিয়ে সুশোভিত করেননি। আর ভদ্রতার সর্বোচ্চ পরিশুদ্ধতার নাম হলো তাকওয়া।"
- উত্তম পরামর্শ প্রদান : দ্বীনি ভাইদের জন্য অন্তর পরিশুদ্ধ রাখা এবং তাদেরকে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেওয়া জরুরি। আল্লাহ তা'আলাও কুরআনে বিশুদ্ধ অন্তরের কথা বলেছেন (২৬: ৮৯)। আর প্রখ্যাত সালাফ সারি আস সাকাতি (রহ.) বলেন, "নেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বোত্তম শিষ্টাচার হলো ভাইদের জন্য অন্তরে বিশুদ্ধ অন্তর লালন করা এবং তাকে সুপরামর্শ দেওয়া।"

এর পাশাপাশি, কল্যাণকর সুবহার জন্য আরও কিছু কার্যকরী পন্থা রয়েছে। যেমন–

- এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন, যাতে লোকজন আপনার সুহবা লাভ করতে চায়। রাসুল (সা.) বলেন, "একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি মানেই হলো সামাজিক ও বন্ধুত্বপরায়ণ একজন মানুষ। যে বন্ধুত্বপরায়ণ নয় এবং যাকে কেউ বন্ধু বানাতে চায় না তার মধ্যে উত্তম কিছুই নেই।" (তাবারানি)
- উত্তম সুবহাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত মনে করুন। রাসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তির মঙ্গল করতে চান তখন তার জন্য একজন সত্যবাদী সঙ্গী নিযুক্ত করেন। যদি সে আল্লাহকে ভুলে যায়, তাহলে উত্তম ঐ সঙ্গী তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যদি সে আল্লাহকে স্মরণ করে তবে সঙ্গী তাকে আরও বেশি সাহায্য করে।" (আবু দাউদ)
- সুহবার বিষয়ে সৎ ও সচেতন হন। রাসুল (সা.) বলেন, "একজন মুমিন অপর মুমিনের আয়না। মুমিন বান্দা অপর মুমিনের ভাই যিনি লোকসানের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে সুরক্ষা দেন। (আবু দাউদ) হাদিস বিশারদেরা এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়নায় যেমন কারো চেহারা ভিন্ন রকম দেখা যায় না। মুমিন বান্দাও তার অপর

সহযোগী মুমিনের বিষয়ে একদম যথাযথ বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। বাড়তি প্রশংসা বা বাড়তি সমালোচনা থেকে দূরে থাকবেন।

- নেককার বান্দাদের সুহবা হিসেবে পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

কার্যকরী পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ

পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান হলো এমন একটি সম্পর্ক যা মানুষকে শিখতে, পরিণত হতে এবং সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগাতে সহায়তা করে। আপনি যদি প্রশিক্ষক বা পরামর্শ প্রদানের অবস্থানে থেকে থাকেন, তাহলে নিম্নলিখিত কৌশলগুলো আপনার কাজকে আরও বেগবান করবে–

১. পরিষ্কার লক্ষ্য নির্ধারণ করা : শিক্ষক বা পরামর্শক হিসেবে আপনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন। আপনি পরামর্শগ্রহীতাকে কী বলতে চান এবং বোঝাতে চান তাও নির্ণয় করুন।

২. আস্থা তৈরি করুন : একটি আস্থাভাজন পরিবেশ তৈরি করুন। সততাপূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করুন এবং ভালোভাবে শ্রবণ করুন।

৩. প্রত্যাশা নির্ধারণ করুন : আপনার ভূমিকা, দায়িত্ব ও প্রত্যাশা নির্ণয় করুন। একটি সমন্বিত এবং সৃজনশীল অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক তৈরি করে নিন।

৪. দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিন : যাকে প্রশিক্ষণ বা পরামর্শ দিচ্ছেন তাদের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা এবং শেখার ধরনকে বিবেচনায় নিয়ে তার সাথে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করুন। সেই অনুযায়ী নিজের কৌশল প্রয়োগ করুন।

৫. দিক নির্দেশনা ও সমর্থন নিশ্চিত করুন : প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আপনার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং অন্তদৃষ্টি প্রদান করুন। ইতিবাচক সাড়া দিন। তাদের জীবনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো অতিক্রম করতে সহায়তা করুন।

৬. লক্ষ্য নির্ধারণ করতে উজ্জীবিত করুন : প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করুন। সে যদি বড়ো কোনো লক্ষ্য স্থির করে তাহলে এগুলোকে ছোট ছোট কিছু লক্ষ্যে বিভক্ত করুন। লক্ষ্য অর্জনে সে কতদূর এগুলো তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।

৭. দক্ষতা বৃদ্ধি করুন : প্রশিক্ষণার্থীর ঠিক যে বিষয়গুলোতে দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তাকে প্রাসঙ্গিক সম্পদ ও উপকরণ দিয়ে ঐ দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করুন। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন। নিয়মিত শিক্ষা ও উন্নতিকে উৎসাহিত করুন।

৮. নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করুন : প্রশিক্ষণার্থীকে পেশাদার নেটওয়ার্কিং এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যাওয়ার মতো সুযোগ তৈরি করে দিন।

৯. ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন : প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়মিত কার্যকরী, ইতিবাচক এবং গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিন। যে বিষয়গুলোতে তার উন্নতি করার অবকাশ রয়েছে সেগুলো তাকে অবহিত করুন।

১০. অর্জনগুলো উপভোগ করুন : প্রশিক্ষণার্থীর সফলতা ও অর্জনগুলো উদযাপন করুন। এতে করে তার ভেতর আস্থা ও বিশ্বাস বাড়বে।

১১. নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করুন : নিয়মিত ই-মেইল ও বৈঠকাদির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করুন। যোগাযোগের মাধ্যমগুলো সবসময় সচল রাখুন।

১২. মূল্যায়ন : প্রশিক্ষণার্থীর সাথে যে সম্পর্ক তা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করুন। আপনার কোন কৌশলগুলোতে কাজ হলো আর কোনখাতে আরও উন্নতি করার সুযোগ আছে তাও নির্ধারণ করুন।

উপরিউক্ত এ ধাপগুলো অতিক্রম করে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও গতিশীল সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। এর মাধ্যমে উভয়ের ব্যক্তিগত উন্নতি নিশ্চিত হয় এবং অমিত সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। ব্যক্তিগত উন্নতির বিষয়টি ধারাবাহিক বা চলমান একটি বিষয় যার জন্য নিয়মিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ব্যক্তিগত উন্নতির আরও কিছু ধাপ বা প্রক্রিয়া আছে। যেমন–

১. লক্ষ্য নির্ধারণ করা : নির্দিষ্ট, অর্জনীয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। লক্ষ্য স্থির থাকলে ব্যক্তিগত উন্নয়নটি ত্বরান্বিত হয় এবং যেকোনো কাজের একটি ফোকাস অক্ষুণ্ন থাকে।

২. আত্ম-পর্যালোচনা করুন : আপনার শক্তি, দুর্বলতা, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যগুলোর দিকে খেয়াল রাখুন। নিজেকে বোঝার চেষ্টা করুন।

৩. নিয়মিত শিখুন : নিয়মিত শেখার ও জানার একটি মানসিকতা গড়ে তুলুন। নতুন নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হোন। বই পড়ুন। নতুন কোর্সে ভর্তি হন। কর্মশালায় অংশ নিন। চারপাশের জগত সম্বন্ধে জানতে কৌতুহলী হয়ে উঠুন।

৪. স্বাস্থ্যকর কিছু অভ্যাস গড়ে তুলুন : আপনার ভালো থাকা সুনিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক কিছু অভ্যাস গড়ে তুলুন। এই সব স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মধ্যে আছে ভারসাম্যপূর্ণ খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম করা, পর্যাপ্ত ঘুম, এবং মেডিটেশনের মতো মানসিক কিছু অনুশীলন।

৫. আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন : নিজেকে মেলে ধরুন। আত্মবিশ্বাস তৈরিতে কাজ করুন। সফলতাগুলোকে স্বীকৃতি দিন– তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।

৬. আপনার কমফোর্ট জোনটি বৃদ্ধি করুন : এমন কিছু চ্যালেঞ্জ নিন যেগুলো আপনাকে কমফোর্ট জোনের বাইরে যেতে প্ররোচিত করে। কারণ প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার মধ্য দিয়েই মানুষের উন্নতি হয়, বিকাশ হয়, প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ে এবং খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

৭. **কার্যকরী সময় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করুন** : আপনার কাজগুলোতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করুন। সময়কে কাজে লাগান। এতে আপনি জরুরি কাজটি চিহ্নিত করতে পারবেন। আপন-

ার চাপ কমে আসবে এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে পারবেন।

৮. ইতিবাচক সম্পর্কের চাষাবাদ করুন : ইতিবাচক এবং গঠনমূলক মানুষের আশপাশে থাকুন। সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটবে এবং সমর্থন পাওয়ার মতো নেটওয়ার্কও প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯. আবেগমিশ্রিত বুদ্ধিমত্তার চর্চা করুন : আপনার আবেগগুলো উপলব্ধি করে ভালোভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে আপনি অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারেন।

১০. ঝুঁকি নিন : ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেন না। নতুন কোনো ক্যারিয়ার বেছে নিন, বা কাজ শুরু করুন। ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেন না। ঝুঁকি নেওয়ার মাধ্যমে আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং ব্যক্তিগত উন্নতি সুনিশ্চিত হবে।

১১. খাপ খাওয়াতে শিখুন : যেকোনো পরিবর্তনকে মেনে নিন। এর সাথে খাপ খাওয়াতে শিখুন। জীবন একটি গতিশীল যাত্রা। নতুন নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারলে আপনি চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে শিখবেন। ইতিবাচক একটি দৃষ্টিভঙ্গিও লালন করতে পারবেন।

১২. যে কোনো অর্জন উদযাপন করুন : আপনার সফলতাকে স্বীকৃতি দিন, উদযাপন করুন– তা যত যৎসামান্যই হোক না কেন। এই উদযাপন আপনাকে ইতিবাচক হতে সহায়তা করবে। ফলে আপনার বিকাশ ঘটবে।

১৩. অপরের মতামত নিন : অপরের কাছ থেকে মতামত নিন। ইতিবাচক মতামত ও প্রতিক্রিয়া আপনাকে নিজের সম্ভাবনাগুলো সনাক্ত করতে সাহায্য করবে।

১৪. অপরকে সহায়তা করুন : অপরের প্রতি দরদি হোন। তার চেষ্টায় সহায়তা করুন। মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত উন্নতি দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রক্রিয়া। পুরো জীবন ধরেই এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন থাকে। ইতিবাচক অর্জনের জন্য সময় দিতে হয়। ধৈর্য ধারণ করুন। নিজের লক্ষ্যের প্রতি স্থির থাকুন। আপনার চলার পথে যে সুযোগগুলো আছে সেগুলো নিন এবং কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।

এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু টিপস

নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে চলুন : আপনার ঈমান ও নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন সুহবা এড়িয়ে চলুন। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের সুহবা একইসাথে বজায় রাখলে কালক্রমে দেখা যায়, নেতিবাচক সুহবার প্রভাবটা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

হিংসা থেকে দূরে থাকুন : আল্লাহ যদি কাউকে কোনো নেয়ামত দেন তাহলে তা নিয়ে হিংসা করা যাবে না। বরং আল্লাহর নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত, প্রশংসা করা উচিত– তা যিনিই পেয়ে থাকুন না কেন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

আবু আল হাসান আল হুযয়িরি (ইন্তেকাল: ১০৭৯) তিন ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করার কথা বলেছেন যেগুলো মানুষের জন্য অবিচ্ছেদ্য এবং একটি অপরটির সাথে আন্তঃসম্পর্কিত।

১. আল্লাহর সাথে যোগাযোগ। অর্থাৎ সবসময়ে আল্লাহর উপস্থিতির বিষয়ে সচেতন থাকা।

২. নিজের সাথে যোগাযোগ যার মাধ্যমে অযাচিত সবকিছু এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং

৩. আল্লাহর সকল সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ। এই বিস্তৃত যোগাযোগের ধারণার মধ্যে আছে, ইবাদত ও আমল, অন্যান্য সাধক ও

দরবেশদের সাথে যোগাযোগ, আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক, রিজিক উপার্জন, বিয়েশাদি সবকিছুই একজন ব্যক্তির সুহবার অন্তর্গত।

মনে রাখবেন, রাসুল (সা.) তাঁর গোটা দিনের পরিকল্পনা করতেন নামাজের ওয়াক্তকে কেন্দ্র করে। আমাদের তাই অনুসরণ করা উচিত। রাসুল (সা.) সারাদিন অনেক কাজ করতেন। স্বামী হিসেবে, পিতা হিসেবে, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে, উম্মাহর নেতা হিসেবে এবং সর্বোপরি নবি হিসেবে তাঁর অনেক দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তার জীবনে কখনোই ঐ মাত্রায় পেরেশানি ছিল না। বরং সবকিছুই তিনি সমন্বয়ের মাধ্যমেই করতে পারতেন।

পরিবারে তিনি কতটা সময় দিতেন তা ভাবলেও রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রচণ্ড ব্যস্ততার ভীড়েও তিনি প্রতিদিন ৪-৫ দফায় পরিবারকে সময় দিতেন। আবার তিনি মানুষের খোঁজ রাখতেন। অসুস্থকে দেখতে যেতেন। বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। রাসুল (সা.)-এর এত কিছু করার নেপথ্য শক্তি লুকায়িত ছিল তাঁর গভীর রাতের নামাজ ও ইবাদত পালনের মাঝে। এ আমলগুলো করে তিনি অবিশ্বাস্য বারাকাহ লাভ করেছেন। রাতের আমলের বরকতে তাঁর দিনের কার্যক্রমগুলোও বরকতময় হতো। নেক আমলে সমৃদ্ধ একটি জিন্দেগীর কারণেই সার্বিকভাবে তিনি একটি সফল, উৎপাদনমুখী ও সৃজনশীল জীবন যাপন করতে পেরেছেন।

লেখক: রিসার্চ, পাবলিকেশন ও এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি, এমসিএ

অব্যক্ত অনুভূতি

শামীম বিন সাঈদী

আব্বার ঐ মায়াবী শেষ হাঁসি একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। চাঁদের আলোর পিছনে যেমন মেঘ জমে থাকে ঠিক তেমনি আব্বার হাস্যোজ্জ্বল চেহারার পেছনে অনেক না বলা কথা জমেছিল। আপন কাউকে যেন তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকছেন কিন্তু কাছে থেকেও সামনে বাঁধার দেয়াল তুলা দেওয়া হয়েছিলো। আমি তখন আমেরিকা। আব্বার পবিত্র জান্নাতি হাঁসির সামনে আমার আমেরিকার সব প্রোগ্রাম নিমিষেই পরিবর্তন হয়ে গেল। আমার হৃদয়টা কেন যেনো কেঁদে উঠলো। মনে হচ্ছিলো আব্বা আমাকে ডাকছেন। শামীম তুমি দেরী করছো কেন, আসছো না কেন? তাই কোন কিছুই আমাকে আটকাতে পারেনি। সব ফেলে সোজাসুজি বিমানবন্দর। টিকিট কেটে বিমান বসলাম। পরিবারের সদস্যদের বোবাকান্নায় কণ্ঠ ভারি হয়ে আসছিলো। ফোনে যেন আম্মার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। ছোট ভাই মাসুদ আর নাসিম বারবার চেষ্টা করেও আব্বার সাথে দেখা করার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। এ আর্তনাদ শুনতে শুনতে মনের অজান্তেই চোখ বেয়ে পানি ঝড়ছে। তবুও বুক ভরা আশা, দেশে গিয়ে আব্বার সাথে দেখা করে সব আব্বাকে খুলে বলবো। এরই মধ্যে বিমান আকাশে উড়তে শুরু করলো। আর কথা হলো না।

দুবাই এয়ারপোর্টে ৫ ঘণ্টা যাত্রা বিরতি। মোবাইল সুইচ অন করতে চেষ্টা করলাম। ১৩৩টা মিস কল এবং ৮০০ এর বেশি ম্যাসেজের কারণে মোবাইল অন হচ্ছে না। একপর্যায়ে মোবাইল হ্যাং হয়ে গেলো। রিস্টার্ট করলাম। সাথে সাথে নিয়াজ ভাইয়ের রিং ঢুকলো, রিসিভ করলাম। তিনিই প্রথম জানালেন স্যার আল্লাহর জিম্মায় চলে গেছেন,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

আব্বা আর নেই। আমার সব শেষ হয়ে গেল। আমার দুই ছোট ভাই মাসুদ এবং নাসিমকে কল করছি কিন্তু ধরাতে পারছি না। অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কাউকে পাচ্ছি না। একের পর এক চেষ্টা করছি কাউকেই পাচ্ছি না। সমস্ত দেশ ব্যস্ত, আমার পৃথিবী অন্ধকার। আসলেই কী আব্বা আর নেই? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, মাত্রই না আব্বার ভুবন ভুলানো হাসি দেখলাম! ভাবতে ভাবতেই আমার সর্বকনিষ্ঠ আদরের ছোট ভাই নাসিম ফোন রিসিভ করছে। কোনো কথার আওয়াজ পাচ্ছি না। সবাই কাঁদছে। হঠাৎ নাসিমের কণ্ঠে মেঝো ভাই আব্বা নাই। আমি শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম; আম্মা জেনেছেন? মাসুদ কোথায়? শুধুই কান্নার আওয়াজ। আমি আমাদের প্রধান মুরুব্বিকে ফোন করলাম, আমি কিছু কথা তাকে জানালাম এবং তিনিও আমাকে কিছু পরামর্শ দিলেন।

একের পর এক ফোন আসছে। কোথায় দাফন হবে? জানাযা কখন? ঢাকায় কি জানাযা হবে? হুজুরের অসিয়ত ছিলো, দাফন খুলনায় হবে তো? হাজারো প্রশ্ন আর অপেক্ষা করছি প্লেনের? কখন ছাড়বে আর কখন ঢাকা যাবো? আমি কি আব্বাকে শেষবারের মতো একনজর দেখতে পাবো?

ঢাকায় আসার জন্য আবার বিমানে উঠলাম। বিমানের দরজা বন্ধ। বারবার জানালা দিয়ে উঁকি দেই এই বুঝি ঢাকায় ল্যান্ড করলাম। সময় আর ফুরাচ্ছে না। আকাশে উড়তে থাকা মেঘের মতোই কষ্টগুলো যেন বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে। পুরো জার্নিটা চোখ দুটো এক করতে আর পারিনি। চরম উৎকণ্ঠায় কেটেছে প্রতিটি প্রহর। যা হোক অবশেষে ঢাকা বিমানবন্দরে

অবতরণ করলো বিমান। সবার আগে নামার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কি হবে! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশেষ বাহিনী আমাকে প্রায় একঘণ্টা শুধু বসায় রাখলেন। বিমানবন্দরে বসে আছি। নিজেকে একদম জেলাখানার কয়েদি মনে হচ্ছিলো। আব্বার জানাজায় শামিল হতে চাওয়া যেন বড়ো অন্যায়। তাই তারা আমাকে শাস্তি স্বরূপ এই নেক্কারজনক আচরণ করছে, করুক। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। মনে মনে কিছু তেলাওয়াত করছি, জিকির, তাসবিহ, তাহলিল করছি।

ও আল্লাহ, আল্লাহ গো আমাকে আব্বাকে একবার দেখার সুযোগ করে দাও।

বিমানবন্দরে আমার লাগেজ ফেলে রেখে দ্রুত গাড়ির দিকে রওনা হলাম। আব্বার পবিত্র মুখখানি একটু দেখতে যেন পাই। তাঁর জানাজায় যেন শামিল হতে পারি। গাড়ি নিয়ে রায়হান, এমদাদ, হেলাল, মামুন, আরজু, রাশেদ, টিটু, জুয়েল, রোকনকে নিয়ে আমরা পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

এদিকে সবাই ফোন দিচ্ছেন কখন আসবে? কতদূর? আমেরিকা এবং দুবাই এয়ারপোর্টে থাকতেই বিভিন্ন সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ খোঁজ-খবর নিয়েছেন, এর মধ্যে যাদের নাম না বলেই নয় লেখক ও গবেষক মাহমুদুর রহমান, বিএনপির তারেক রহমান, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাস, মোছাদ্দেক হোসেন ফালু, অন্যান্য আলেম উলামা সবাই খুব আফসোস করলেন, তাদের স্মৃতিচারণ করে কিছু কথা বললেন। আমি তাদের কাছে আব্বার জন্য দুয়া চাইলাম।

সেদিন ১৫ই আগস্ট জানাজার নামাজের জন্য পিরোজপুরে লাখ জনতার ঢল। সবাই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা কখন আমাদের পরিবারের লোকেরা যাবেন জানাজায় শামিল হবেন। রাত থেকে হাজারো জনতা আব্বার চারিদিকে ঘিরে ছিলেন, তাকে হাসপাতাল থেকে বের করতে দেয়নি। তাঁর জানাজার নামাজ হবে পরে তাঁর ওসিয়ত মত খুলনায় দাফন হবে। এটাই ছিল সকলের প্রাণের দাবি, কিন্তু ফজরের সময় ঘটলো ভিন্ন চিত্র। গোটা শাহবাগ এলাকা রণক্ষেত্র। আব্বার জানাজা কোনো অবস্থাতেই ঢাকায় হতে দেবে না। যাই হোক এটা একটা ইতিহাস। যারা সেই রাতে আব্বার জন্য কষ্ট করেছেন সকলের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে দুয়া ও ভালোবাসা রইলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন।

বিমানবন্দরে আবদ্ধ থেকেও সবার সাথে কথা বলেছি, আমার জন্য যেন একটু অপেক্ষা করা হয়। আমি যেন অন্তত জানাযার নামাজে শামিল হতে পারি। বিমানবন্দর থেকে অনেক কষ্টে মুক্ত হয়েও লাখ জনতার সাথে জানাজায় শামিল হতে পারলাম না। কলিজায় যে আঘাত পেলাম তা আর বলে বুঝাতে পারবো না। তবুও একটু প্রশান্তি পাই যে, আমরা ছোট নাসিম ও মাসুদ ছিলসহ পরিবারের অন্যন্য সদস্যরা ছিল। আমার সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনেক কষ্ট করে, সেই রোঁদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, কাঁদা পানির মধ্যে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আল্লাহ আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বিদের কবুল করুন।

অবশেষ মানুষ জানাজা শেষ করে ফিরছে, আমি পিরোজপুর ফাউন্ডেশন মাঠেও ঢুকছি। কান্নার রোল পড়ে গেল। সবাই জড়িয়ে কাঁদছে। অবশেষে আব্বাকে দেখলাম। আমেরিকা যাওয়ার আগে আব্বা আমাকে বলেছিল, 'আমার জন্য কয়টা টুপি আর আতর নিয়া আসবা', আতর আর টুপি আনলাম কিন্তু আব্বাকে আর দিতে পারলাম না। আব্বা ঘুমিয়ে আছে, হাজারো স্মৃতি মনে পড়ছে আর কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে। মাত্র দুইটা দিনে কী হয়ে গেল! আল্লাহ্ রহম করুন, দেশ-বিদেশের লাখ জনতা কেঁদেছেন, দেশ বিদেশ থেকে অনেকে চলে এসেছেন। অনেক হিন্দুরা আব্বাকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছেন। অনেক কথা হৃদয়ে জমে আছে। সময় আসবে, সব বলবো ইনশাআল্লাহ। লাখো কোটি মানুষকে কাঁদিয়ে "কুরআনের পাখি" হাসি মুখে দুনিয়া থাকে বিদায় নিয়েছেন। আজও মানুষের সেই কান্না বন্ধ হয়নি। কুরআনের পাখিকে ভালোবেসে প্রতিদিন শতশত মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে পিরোজপুর যাচ্ছেন, দোয়া করছেন। আল্লাহ কুরআনের পাখির সকল নেক আমল কবুল করুন, আমিন।

লেখক: আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দ্বিতীয় সন্তান চেয়ারম্যান, আল্লামা সাইদী ফাউন্ডেশন।

আমাদের অন্তর যেন মরে না যায়

আলী আহমাদ মাবরুর

সহিহ আল তিরমিজি এবং সুনানে আন নাসাঈতে বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছে এমন একটি অন্তর থেকে আশ্রয় চেয়েছেন যে অন্তর আল্লাহর সামনে বিনয়ী হতে জানে না। এমন অন্তর তিনি কখনোই কামনা করেননি যা আল্লাহর সামনে ভয়ে ও বিনয়ে কান্না করে না। আল্লাহর সাথে তুলনাযোগ্য আর কিছুই নেই, এই চরম সত্যটি যে অন্তর উপলব্ধি করতে পারে না– তা থেকেও নবিজি (সা.) পানাহ চেয়েছেন। দু'আটি হলো,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন কলবিন লা ইয়াখশা ওয়া দু'আইন লা ইয়ুসমা ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবা ওয়া মিন ইলমিন লা ইয়ানফা আউজুবিকা মিন হাউলাইল আরবা'ই।'

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন মন হওয়া থেকে যা আপনার ভয়ে ভীত হয় না, এমন দু'আ থেকে যা শোনা হয় না (প্রত্যাখ্যান করা হয়), এমন আত্মা হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন জ্ঞান হতে যা কাজে আসে না। আপনার নিকট আমি এ চার জিনিস থেকে আশ্রয় চাই।" (তিরমিজি : ৩৪৮২, নাসাঈ : ৫৪৭০)

এই দু'আয় 'ইয়াখশা' যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং এ ভয় থেকেই আল্লাহর সামনে বিনয়ী হওয়া। আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন,

۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ١٦

অর্থ : "যারা মুমিন, তাদের জন্যে কী আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা যেন তাদের মত না হয়ে যায়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তারা অনেকটা সময় পেয়েছে। অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (সুরা হাদিদ : ১৬)

অন্তর হলো সকল নেক আমলের ভিত্তি। আমরা কে কতটা ভালো কাজ করতে পারবো তা নির্ভর করে আমাদের অন্তরের শুদ্ধতার উপর। অন্তর পরিশুদ্ধ হলে তা আমাদের পাপ কাজ করতে বাঁধা দেয়। রাসুল (সা.) এ কারণে বলেছেন, "শরীরের ভেতর গোশতের একটি টুকরো আছে। যদি তা বিশুদ্ধ হয়, পবিত্র হয় তাহলে সবকিছুই সুন্দর ও পরিশোধিত হয়। কিন্তু যদি এটি দূষিত হয়ে যায় তাহলে গোটা শরীরটাই দূষিত হয়ে যায়, পঁচে যায়। আর গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্গটিই হলো ক্বলব বা অন্তর।" (আহমাদ : ১৮৪১২)

একটি অন্তর কখন ও কীভাবে আল্লাহর সামনে বিনয়ী হতে ভুলে যায়– তা হযরত উমর (রা.) খুবই চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, সে নিজেকে খোলাসা করে ফেলে। ফলে তার পাপগুলোও সামনে এসে যায়। আর যে ব্যক্তি তার পাপ উন্মুক্ত করে দেয় সে তার অন্তর্নিহিত শালীনতা ও মার্জিত মনোভাব হারিয়ে ফেলে। আর যে ব্যক্তি শালীনতা হারিয়ে ফেলে, তার তাকওয়াও আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। আর যখনই একজন মানুষের তাকওয়া নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই তার অন্তর মরে যায়। মৃত অন্তর আর বিনয়ী হতে পারে না।" অন্যদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "মৃত অন্তরে আবারও প্রাণশক্তি ফিরে আসে যখন মানুষ আমলে সলিহ বা সৎ কাজ বা নেক আমল করতে শুরু করে।"

একজন প্রখ্যাত সালাফ বলেছেন, "মানুষের উপর যতগুলো বিপদ বা বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বিপদ হলো অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। ইহুদি, মুনাফিক ও মুশরিকরা সত্যনিষ্ঠ ইসলামকে চেনার পরও মেনে নিতে পারেনি কারণ তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই দয়া তুলে নেওয়া হয়।' (তিরমিজি, হাদিস নং : ১৯২৩)

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, এক বেদুইন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমি তো কখনো শিশুদের চুমু দিই না। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নিয়ে অন্তরকে কঠিন করে দেন, তাহলে আমার কীই-বা করার আছে?" (বুখারি ও মুসলিম, মিশকাত, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা : ৪২১)।

আল্লাহই অন্তরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক এবং তিনি যেকোনো দিকেই অন্তরকে ধাবিত করতে পারেন। এ কারণে নবিজি (সা.) সবসময় একটি দু'আ করতেন। সেই দুআটি করার আগে আরেকটু প্রাসঙ্গিক আলোচনাও করা জরুরি।

আমরা অন্যের তুলনায় নিজেদের দোষ ত্রুটি নিয়ে কম আলোচনা করি, কারণ নিজেদের নিয়ে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস আমাদের কাজ করে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড, অভিজ্ঞতা, বোঝাপড়াকে আমরা সেভাবেই মানোত্তীর্ণ মনে করি। কিন্তু প্রতিটি মানুষের পতন হতে পারে। আধ্যাত্মিক পতন, চিন্তাগত পতন, আদর্শিক পতন। এই বিষয়টি নিয়ে কেন যেন আমরা সতর্ক হয় না। সম্ভবত, অন্য অনেক কিছুর মতো হেদায়েতটাকেও আমরা চিরস্থায়ী ধরে নিয়েছি বলেই এমনটা হয়। যদিও মানব ইতিহাসের সবচেয়ে অস্থির একটি সময়ে আমরা বসবাস করছি।

অথচ খোদ রাসুল (সা.) নিজেও তার অন্তরের স্থিরতার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। মাঝে মাঝে নয় বরং নিয়মিতই করতেন। শাহর ইবনু হাওশাব (রহ.) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালামাহ্ (রা.)-কে আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার কাছে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় কোন দু'আটি পাঠ করতেন?

তিনি বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় এ দু'আ পাঠ করতেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

উচ্চারণ : "ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কালবি আ'লা দি-ই-নিকা।"

অর্থাৎ "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন।"

উম্মু সালামাহ্ (রা.) একবার এর কারণও জানতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি অধিকাংশ সময়, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কালবি আ'লা দি-ই-নিকা। এই দু'আটি কেন পাঠ করেন?"

রাসুল (সা.) উত্তরে বলেছিলেন "হে উম্মু সালামাহ্! পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার মন আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত নয়। যাকে ইচ্ছা তিনি দীনের ওপর স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা দীন থেকে বিপথগামী করে দেন।"

এই হাদিসের শেষাংশে মু'আজ (রা.) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"রাব্বানা লা'তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব।" (সুরা আল ইমরান : ০৮)

অর্থ : "হে আমাদের রব! আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে আবারও বাঁকা করে দিও না।" (তিরমিজি : ৩৫২২)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনুল কাইউম (রহ.) বলেন, "তোমাদের অন্তর বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে তা তিনটি স্থানে তোমরা নিয়মিত পরীক্ষা করবে। এই স্থানগুলো হলো, যখন তোমরা কোনো জনসমাগমে বসে কুরআনের তেলাওয়াত শুনো, যখন তোমরা একাকী থাকো এবং যখন তোমরা সামষ্টিকভাবে জিকিরে মশগুল থাকো।" (ফাওয়াইদুল ফাওয়াইদ : পৃষ্ঠা ৪৭৯)

অনেক সময়ই আমরা ভালো ভালো কথা শুনি, অনেক ইতিবাচক আহ্বান শুনি কিন্তু তাতে আমাদের অন্তর প্রভাবিত হয় না– কারণ এরই মধ্যে আমাদের অন্তরের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে এবং অন্তরও কঠিন হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া ইবনে মুআজ (রহ.) অন্তরকে কঠিন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ৫টি উপায় বাতলে দিয়েছেন। এগুলো হলো:

- নিয়মিত কুরআনের তেলাওয়াত করা,
- সবসময় পেট খাবারে পূর্ণ করে না রাখা,
- শেষ রাতে ইবাদত করা,
- রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে দু'আ করা, কান্না করা
- নেককার ও ধার্মিক লোকদের সান্নিধ্যে সময় কাটানো।

অন্তর কঠিন হয়ে গেলে আমরা জ্ঞান থেকেও আর কল্যাণ লাভ করতে পারি না। মোহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন, "যদি আল্লাহ কারো কল্যাণ করতে চান তাহলে তিনি তার অন্তরকে এমনভাবে তৈরি করে দেন যাতে ঐ ব্যক্তি ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে।" হযরত আলী (রা.) বলেন, "অন্তরটি যদি জীবিত ও জাগ্রত থাকে তাহলে হেদায়েত পাওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।" এই কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পাপ তখনই সম্পাদিত হয় কিংবা মানুষ তখনই বিচ্যুত হয় যখন তার মন আর সক্রিয় থাকে না। অন্তর মরে

যাওয়ায় যেমন, পাপ করার রাস্তা উন্মোচিত হয় তেমনি বারবার পাপের পুনরাবৃত্তি হলেও অন্তর আর সক্রিয় থাকে না। কেননা, পাপ মানুষকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে।

আন নাওয়াস বিন সামান (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসুল (সা.) কে পাপ ও পুণ্যের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "সকল নেক আমলের নির্যাস প্রকাশিত হয় উত্তম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে, পাপাচার হলো সেই কাজগুলো যা করলে মনে অস্বস্তি অনুভূত হয়; পাপ হলো এমন সব কাজ যেগুলো মানুষের সামনে উন্মোচিত হোক তোমরা তা চাও না।" (মুসলিম : ২৫৫৩)

রাসুল (সা.) এমন একটি আত্মা থেকেও পরিত্রাণ চেয়েছেন যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না– যা সবসময়ই আরও আরও চায়। এই কারণে আমাদের এমন একটি অন্তর লালন করা উচিত যা অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়। ইমাম আল শাফেয়ী (রহ.) বলেন, "যদি আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ ও তৃপ্ত বান্দা হতে পারি তাহলে আমাদের অবস্থা হবে বিরাট এক সম্রাটের মতো।" অন্যদিকে, ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, "আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার সহজ উপায় হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞতার সাথে বিবেচনা করা।" এই বিষয়টি অনুধাবন করা যে, আমরা যা ভোগ করি, কোনোটাই আমাদের সক্ষমতা ও যোগ্যতার কারণেই শুধু অর্জিত হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলাই দয়া করে এগুলো আমাদের দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) এর একটি হাদিসও প্রণিধানযোগ্য।

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো আদম-সন্তানের কাছে যদি দুই উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবুও সে তৃতীয় একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকা অর্জনের ইচ্ছা করবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না। যে লোক তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করে নেন।" (তিরমিজি : ২৩৩৭)

আমাদের নাফস আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আবার আমরা নিজেরাও নফসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে পারি। আমরা যখন নাফসের প্ররোচনা ও ফাঁদে পড়ে যাই, তখন নাফস আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, "নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নাফসের ফাঁদে না পড়ার সর্বোত্তম উপায় হলো, বিভিন্ন সময়ে পরিস্থিতির প্রয়োজনে হালাল করা হয়েছে এমন বিষয়াবলী থেকে নিজেদের দূরে রাখা। এমনটা করতে পারলে আমরা নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবো এবং হারাম থেকে নিজেদের নিবৃত রাখাও বেশ সহজ হয়ে যাবে।" আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, উম্মাহ'র ওপর প্রথম যে বিপর্যয় দেখা দেবে তাহলো উম্মতের সদস্যরা খাবার দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করতে শুরু করবে। মূল হাদিসটি এমন–

উরওয়া বিন জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত। "আমি আমার খালা আয়েশা (রা.) কে বলতে শুনেছি, রাসুল (সা.) এর ওফাতের ওপর উম্মতের ওপর প্রথম যে বিপর্যয়টি নেমে আসবে, তাহলো লোকজন পেট ভর্তি করে খেতে শুরু করবে। আর মানুষের পাকস্থলী যখন খাবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন মানুষের শরীরে চর্বি জমা হয়, তাদের অন্তর দুর্বল হয়ে যায় এবং নাফস শক্তিশালী হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৩/১৬৭)

আমাদের পেট যখন পরিপূর্ণ থাকে, আমাদের মনও তখন নাফসের পরবর্তী চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, আমরা যখন ক্ষুধার্ত থাকি তখনও আমরা আমাদের খাবারের জোগাতেই তৎপর থাকি। উমর (রা.) বলেন, "দরিদ্রতার সম্পর্ক হলো নিরন্তর কামনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের সাথে।" আমরা যখন শুধু পেতেই চাই তখন নিজেদেরকে অনেকটাই দরিদ্র ও অসহায় মনে হয়। রাসুল (সা.) বলেন, "একজন মানুষ যদি দুটো উত্তম বৈশিষ্ট্য লালন করতে পারে তাহলে আল্লাহ তার নামটি কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দার তালিকায় শামিল করে দেন। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হলো, সবসময় এমন মানুষদের দিকে তাকিয়ে থাকা ও লক্ষ্য করা যারা ধার্মিকতায় ও নেক আমলে তুলনামূলক এগিয়ে আছে। প্রয়োজনে তাদের মতো হওয়া বা হতে চাওয়া। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ঐ মানুষগুলোর দিকে তাকানো যারা দুনিয়াবি সম্পদের বিবেচনায় তার চেয়ে আরও পিছিয়ে আছে। এই মানুষগুলোই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করতে পারে। মূল হাদিসটি এমন–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– যার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের মধ্যে তার নাম লিখে রাখেন। আর যার মধ্যে এ দুটি বৈশিষ্ট্য নেই, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের দলে তার নাম লিখেন না। যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়াবলী ও আমলের ক্ষেত্রে তার তুলনায় অগ্রসর লোকের দিকে দেখে এবং তার অনুসরণ করে; আর পার্থিব ব্যাপারে তার চাইতে অনগ্রসর লোকের দিকে দেখে; এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ অনগ্রসর লোকদের তুলনায় যতটুকু মর্যাদা ও নিয়ামত দান করেছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলদের তালিকায় তার নাম লিখে রাখেন।

আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারে তার চাইতে পিছিয়ে থাকা লোকের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তাকে অনুসরণ করে আর পার্থিব ব্যাপারে তার তুলনায় অগ্রসর লোকের দিকে দেখে এবং তার কাছে পার্থিব সামগ্রী না থাকার কারণে আফসোস করে, আল্লাহ তা'আলা তার নাম কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেন।" (তিরমিজি: ২৫১২)

অন্তর যদি নিষ্ক্রিয় থাকে বা নির্জীব থাকে তাহলে একজন মানুষের অন্তর কখনোই আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না। এ কারণে, ঈমানকে ধারণ ও মজবুত করার স্বার্থে আমাদের সকলেরই অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকেই অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার এবং একটি সজীব ও প্রাণবন্ত অন্তর লালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও অনুবাদক।

মিযান-১

মো. সারওয়ার কবির শামীম

সৃষ্টিজগতে নিখুঁত ভারসাম্য ও অকাট্য শৃঙ্খলা মহান স্রষ্টার দৃশ্যমান নিদর্শনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণটি। এ ভারসাম্যের অণু পরিমাণ[১] যদি ভঙ্গ হয় তাহলে পুরো সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। যে কোন সৃষ্টির আকার, এর সংখ্যা বা পরিমাণ, গঠনপ্রণালী, তৎপরতা, খাদ্যাভ্যাস, বসবাস, বিচরণ এবং জীবনাবসান সবই সে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট প্রকাশ। এ ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা মহাশূন্যে, জমিনে, উদ্ভিদজগতে, কীটপতঙ্গ কিংবা প্রাণীজগতে– সর্বত্র বিদ্যমান। পুরো সৃষ্টিজগত তাদের রবের নির্দেশনা অনুযায়ী ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলেছে। কেউ কোনোভাবেই তা লঙ্ঘনের কোন সুযোগ নেই। সে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলার অগণিত রূপ বিদ্যমান। সৃষ্টির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Symbiotic Relation), অভিযোজন ক্ষমতা (Adaptability) তার অন্যতম উদাহরণ।

মহাকাশজগতের বিষয়টি অনুপম, বিস্ময়কর এবং কল্পনাতীত। বিশাল গ্রহ পৃথিবী শূন্যে ভাসছে। প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ (চাঁদ) বিস্ময়করভাবে ভাসমান এবং সকলে সৌরজগতে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। কেবল তাদের রবের মাধ্যাকর্ষণ নামের একটি সিস্টেম বা হুকুম সবকিছুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। মহাশূন্যের অবজেক্টগুলো– পৃথিবী ঘণ্টায় ১ লাখ কিলোমিটার বা ৬৭ হাজার মাইল বেগে, সূর্য ৮লাখ কিলোমিটার– তীব্র বেগে ছুটছে (Orbiting). শত কোটি বছর যাবৎ নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে (Spinning), অন্যকে আবর্তন করছে (Orbiting) এবং ভাসছে একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে। আমাদের রব বলেন,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

"সূর্য আর চাঁদ হিসাব মতো চলে। তারকারাজি এবং বৃক্ষলতা সাজদারত (অনুগত)। আকাশকে তিনি উপরে উঠিয়েছেন এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য" (৫৫:৫-৭)।

সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মহান স্রষ্টার প্রাধান্যপ্রাপ্ত সৃষ্টি (১৭:৭০) মানুষের জন্য। আমাদের রব বলছেন, নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে বড়ো (আকবারু মিন খালকিন্নাস, ৪০:৫৭)। আল্লাহ সে বড়ো বিষয় ও বস্তুগুলোকে মানুষের অধীন করেছেন। এ ভাবেই মানুষ আল্লাহর সম্মানিত ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত সৃষ্টি (অলাকাদ কাররামনা বানি আদামা...ফাদ্দালনা হুম ... মিমমান খালাকনা তাফদিলা, ১৭:৭০)।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ
السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

"তোমরা কি দেখছো না, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছেন তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব নেয়ামাত" (লোকমান ৩১:২০)। (আরও দেখুন ২২:৬৫)।

---

১ মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ (Astronomers) বিশ্বজগত সম্পর্কে তাদের ধারণা হতে বলেন: মহাকাশজগতের শৃঙ্খলা যদি এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ ভঙ্গ হতো তাহলে পুরো বিশ্বজগতে ধ্বংসযজ্ঞ সংগঠিত হয়ে সবকিছু তুলার মত উড়তে থাকতো। এক হাজার মিলিয়ন বা একশ' কোটিতে এক বিলিয়ন। এক হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন। যা সংখ্যায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০।

সূর্য ঠিক অবস্থানে থেকে সৌরজগতে ভারসাম্য স্থাপন করেছে। দূরে হলে সাগরের সকল পানি বরফ হতো, কাছে হলে সব পানি বাষ্পাকারে উড়ে যেত, সবকিছু অকার্যকর হতো। বায়ুমণ্ডলীয় স্তর এবং সঠিক এয়ার প্রেশার না থাকলে সব পানি বাষ্পাকারে উড়ে যেত। মাটিতে জৈব/অজৈব উপাদান সঠিক অনুপাতে না থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগম হতো না। সবকিছু মানুষের জন্য। সর্বত্র ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা বিরাজমান। পৃথিবীতে একজন মানুষের বিপরীতে দশ লক্ষ পিঁপড়া আছে। অথচ হাতি, জিরাফ, গণ্ডার কিংবা হিংস্র পশুর সংখ্যা সে অনুপাতে বিস্ময়করভাবে স্বল্প।

وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

"আমি সকল প্রয়োজনীয় উপাদান সঠিক-পরিমাণে উৎপাদন করেছি" (হিজর ১৫:১৯)।

পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ পানি বা সাগর। অথচ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পানি নাযিল হয় আকাশ হতে। সে পানি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এবং ভিন্ন কাজের। সে পানি নাযিল হয় পরিমাণমত। বেশি বা কম হলে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

"আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করি পরিমাণমত। অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি।" আরও আল-মুমিনুন ২৩:১৮।

মানবজীবনের প্রতিটি কর্ম চ্যালেঞ্জযুক্ত। সবচাইতে বড়ো চ্যালেঞ্জটির নাম ভারসাম্য। মানুষকে যে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূর্ণ ভারসাম্য টুল বা যন্ত্র দেওয়া হয়েছে তার নাম দ্বীন, লাইফলাইনও বটে। আল্লাহর দেওয়া দ্বীন ভারসাম্য তৈরি করে, ভারসাম্য উৎসাহিত করে, ভারসাম্য নির্দেশ করে, ভারসাম্য বজায় রাখার যাবতীয় কলা-কৌশল প্রকাশ ও প্রয়োগ শিখায়; পুরো দ্বীন দাঁড়িয়ে আছে ভারসাম্য যন্ত্রের উপর। অতীত জাতির সফলতার মূলে সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষা এবং ব্যর্থতার মূলে ভারসাম্য ভঙ্গের তথ্যবহুল উদাহরণ সমূহ বর্ণনা করে সতর্ক করে। জীবনের সকল অধ্যায়ে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষ সফল হতে পারে।

মানুষ ভোরে ঘুম হতে জাগে। জেগে ওঠার মাধ্যমে তার ভারসাম্য রক্ষার তৎপরতা তথা সংগ্রাম (ছা'য়া ৯২:৪) শুরু হয়। সর্বপ্রথম সে যে কাজের প্রস্তুতি নেয় তা হলো সালাত। সে সালাতে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য টুল (মিজান ৪২:১৭) আল-কোরআনের নির্দেশনাগুলো পাঠ করে ও নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সালাত যেন তাকে তার অজান্তে কোন স্বপ্নের জগতে নিয়ে না যায় তাই তাকে তার চক্ষু (সালাতে চোখ বন্ধ রাখা নিষেধ) ও কর্ণ সজাগ রাখতে হয়। তার মন যেন কোন অচিন দেশে বেশি সময়ের জন্য চলে না যায় তাই সে তার নিকটস্থ ও পরিচিত পশু-পাখি, মৌমাছি, পাহাড়, দুধ, খাদ্য, ফসল-উৎপাদন, মাছ, নদী, সাগর, আকাশ, বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ক আয়াত পাঠ করে। মানুষের স্রষ্টা মানুষকে ভারসাম্য যন্ত্র আল-কোরআন পড়ার সুন্দর ও নিয়মিত ব্যবস্থা করেছেন। ফলে তার সকল কর্মতৎপরতা সর্বদা ভারসাম্য-চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে। আশা করা যায় সে ভারসাম্য আপস করে কোন কাজে জড়িত হবে না, তা আপাত দৃষ্টিতে যতই লাভজনক মনে হউক।

কর্মব্যস্ত-দিন যখন মানুষকে তার ভারসাম্য টুলসগুলো ভুলিয়ে দেয় (এবং ভারসাম্য নষ্টের উপক্রম হয়) ঠিক তখনই স্রষ্টা তাকে দুপুরের সালাতে আবারো ভারসাম্যের উপাদানগুলো পড়তে নির্দেশ দেন। তখন সে তার ব্যবসা, কর্ম, অধীনদের অধিকার, কর্মচারীর পাওনা, সাপ্লাইয়ারের অর্থ পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ক মানদণ্ড (২:১৮৫) ও ভারসাম্যের নির্দেশনা পাঠ করতে থাকে। তাকে একটি বড়ো দর্শন স্মরণে রাখতে হয়; সৎ কর্মে তৎপর থাকা, অসৎ কর্ম এড়িয়ে চলা (৩:১১৪), ভারসাম্য নষ্টকারী লাভ-লোভে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কর্মে প্রতিযোগিতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মোকাবেলা করে তাকে সত্য-সুন্দর-কল্যাণকর কাজের প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করে (৫:২)। যখন সে কর্মব্যস্ত দিন শেষে ঘরে ফেরে তখনো তাকে ভারসাম্য টুলস প্রয়োগের অধীনে থাকতে হয়। মাগরিবে সে পরিবার বিষয়ক ভারসাম্য টুলস পাঠ করে। স্ত্রী/স্বামীর অধিকার আদায়, সন্তান লালন-পালনে সময়-মেধা ব্যয়, তাদেরকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্র গঠনে প্রচেষ্টা চালানো, নিজ ঘরকে একটি আদলযুক্ত (৬:১১৫) ভারসাম্যের দুর্গে পরিণত করা ইত্যাদি।

দৈনন্দিন রুটিন মাফিক জীবনে একঘেঁয়েমী আসলে সালাত স্মরণ করিয়ে দেয়; দুনিয়া ঘুরে দেখ, কুল ছিরু ফিল আরদি (৬:১১, ২৭:৬৯, ২৯:২০)। এতে তার ভারসাম্য দর্শন সচল ও জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়। তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উন্নত হয়। সচেতনতা ও স্পর্শকাতরতা শুদ্ধ হয়। অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়। ফলে তার দৈনন্দিন জীবনের হৈ-হাঙ্গামায় ভারসাম্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজতর হয়।

আল্লাহ তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে ভারসাম্য বিষয়ে সাবধান করেছেন। তারা যেন জীবনের কোন ক্ষেত্রে ভারসাম্য ভঙ্গ না করে।

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

"সাবধান! তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন করো না। ন্যায্যভাবে ওজন কায়েম করো এবং ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত করো না।" ৫৫:৮-৯।

পারিবারিক, সামাজিক কিংবা ব্যবসায়িক, ব্যক্তিগত কিংবা সামষ্টিক সর্বাবস্থায় আল্লাহর দাসগণ ভারসাম্য নীতির অধীন। সর্বদা তাকে তার ওয়াদা ও আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় (৯:৪, ২৩:৪)। ওয়াদা ও আমানাহ রক্ষার উপর সমাজের গাঁথুনির শক্তি ও পারস্পরিক সহনশীলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

"যারা ওয়াদা পূরণকারী ও আল্লাহ সচেতন, আল্লাহ এ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন" (৩:৭৬)

পারিবারিক জীবন অসহনীয় হলেও আল্লাহর দাসগণ ভারসাম্য লঙ্ঘন করতে পারে না। পছন্দ-ভালোবাসা-ঘৃণা-লাভ-লস সর্বাবস্থায় ভারসাম্য রক্ষায় কোন আপস নয়।

তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে ঠিকমত প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সরবরাহ করতে হবে; এটা মুত্তাকি বা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের একটি দায়িত্ব। (২:২৪১)

যারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ[২] (ফাদল) ভোগ করছে তারা সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদিতে ব্যাপক ছন্দপতন ঘটাতে সক্ষম। এগুলো ভোগ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, জানমালের ক্ষতি, জুলুম, অত্যাচার ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বত্র ভারসাম্য নষ্ট অতি সাধারণ ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যাপক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, জনসমর্থন, সম্মান ইত্যাদির স্বাদ পেয়েছিলেন নবি ইউসুফ, সোলায়মান কিংবা তাঁর পিতা দাউদ (আ.) অথবা শেষ নবি মুহাম্মদ (সা.)। অথচ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, জনসমর্থন, সম্মান ইত্যাদি ফাদলের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারে তাদের অনুসারীর সংখ্যা পুরো মানবেতিহাসে অতি-অতি-অতি নগণ্য। বরং ফিরাউন, হামান, কারূন ইত্যাদির ভক্তসংখ্যা অগণিত, যত্র-তত্র। মহান আল্লাহ সাবধান করছেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾

"আখেরাতের সে ঘর আমরা তৈরি করেছি তাদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না এবং সৃষ্টি করতে চায় না ফাসাদ, আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যেই। যে কেউ (সেখানে) কোনো ভালো কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, সে তার চাইতে উত্তম প্রতিফল লাভ করবে। আর যে কেউ মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তবে যারাই মন্দ কাজ করেছে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে কেবল তাদের আমলের অনুরূপ।" (২৮:৮৩-৮৪)।

সর্বযুগে ভারসাম্য রক্ষাকারীগণ সংখ্যায় নগণ্য। মানুষের দখলে থাকা সকল ফাদল আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। ফাদল ভোগকারীগণ যদি জীবনের মৌলিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে, তারা সংখ্যায় যতই ছোট হোক আল্লাহর নিকট তারা কখনো ভারসাম্য নষ্টকারীদের মত হবে না।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٨٢﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আমি কি সমান গণ্য করবো? মুত্তাকিদেরকে কি আমি ফাসাদীদের মতো করবো?" (৩৮:২৮)।

মহান আল্লাহ পুরো পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি (ঝড়ষধৎ চষধংসধ) হতে রক্ষার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড নামক প্রতিরক্ষা কবচ স্থাপন করেছেন। এ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জানা-অজানা বহু ব্যবহার রয়েছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করে পাখি, পশু, জিপিএস, স্যাটেলাইট, সাগরে জাহাজ চলাচল ইত্যাদিও উপকৃত হয়।

মহান আল্লাহ একটি মাত্র গ্রহকে সবুজ বানিয়েছেন; পৃথিবী। সেখানে তিনি পূর্ণ শৃঙ্খলা কায়েম করেছেন, সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। সে পৃথিবীর মানুষ যখন তার স্বাধীনতা ও সম্মানকে অপব্যবহার করে, শৃঙ্খলা নষ্ট করে ভারসাম্য ধ্বংস করে তখন পুরো সৃষ্টিজগত গোস্বায় ফেটে পড়ে মানুষকে পিষে ফেলতে চায়।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

"আসমানসমূহ তাদের ওপরের দিক হতে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাদের প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে আর জমিনের অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (আরও আশ-শুরা ৪২:৫)।

কিন্তু কোনো সৃষ্টি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আল্লাহর মর্যাদাবান ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত সৃষ্টি মানুষের কোন ক্ষতি করতে অক্ষম।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"তুমি কি দেখনি! আল্লাহ তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন পৃথিবীর সবকিছু? এবং জলযান সমূহকে! তারই আদেশে তা সমুদ্রে চলে। তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন যাতে তাঁরই আদেশ ব্যতীত তা পৃথিবীর উপর পতিত না হয়।" হাজ্জ ২২:৬৫।

---

2 আল্লাহর ফাদলের মধ্যে ক্ষমতা, সম্পদ, কর্তৃত্ব, জনপ্রিয়তা এবং নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য। এ ফাদলগুলো মানব সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে, জনপদকে সর্বাধিক আলোড়িত করে। এসব ব্যবহার করে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়, যেমনটি করেছে ফিরাউন, জোশেফ স্টালিন, তোজো, মাও-গং। আবার একই উপাদান ব্যবহার করে জনতাকে উন্নতি-অগ্রগতির চূড়ায়ও তোলা যায়, যেমনটি করেছেন ইউসুফ আ., দাউদ আ., সোলায়মান আ., মোহাম্মদ সা.।

মুসলমানদের সোনালী অতীত (২য় পর্ব)

আবু নাঈম মু শহীদুল্লাহ

৫ম সংখ্যার পর...

ইসলামের আলোয় আলোকিত ছিল অর্ধপৃথিবী। ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা মানুষদেরকে পৃথিবীর কেউই ধমিয়ে রাখতে পারেনি, পারবেও না। এটা স্বয়ং আল্লাহর চ্যালেঞ্জ–

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

“এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।” (৬১:৮)

মদিনায় রাসুলুল্লাহ ((সা.)) এর নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনাকালীন সময় আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। ৬৩২ সালে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হন সিদ্দিকে আকবার হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রা.)। ৬৩৪ সালের ২২ আগস্ট মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের এক জলন্ত নক্ষত্র। তাঁর শাসনামলে ইসলাম ও জনগণের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ২৭ মাস খেলাফতকালে উনাকে বেশ কিছু অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তিনি তা সফ-লভাবে মোকাবেলা করেছেন। নতুন নবি দাবিকারী বিদ্রোহীদেরকে তিনি রিদ্ধার যুদ্ধে দমন করেছেন। ইসলামি খেলাফত সম্প্রসারণে বাইজেন্টাইন ও সাসান সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। যা ইতিহাসের নতুন মোড় নেয়। মদিনার উত্তর-পূর্ব দিকে পারস্য সাম্রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল:

১. আরব এবং এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে বেশ কিছু আরব যাযাবর গোত্রের বসবাস ছিল, যারা এই দুই সাম্রাজ্যের মিত্র হিসেবে কাজ করত। আবু বকর (রা.) এর আশা ছিল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাদের আরব ভাইদের সাথে একতাবদ্ধ হবে।

২. পারস্য ও রোমানদের কর ব্যবস্থা ছিল অন্যায্য প্রকৃতির। তাই এসকল অঞ্চলের বাসিন্দারা মুসলিমদের অধীনে থাকতে পছন্দ করবে বলে বিশ্বাস করা হত।

৩. দুইটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে থাকার ফলে আরব নিরাপদ ছিল না। তাই ইরাক ও সিরিয়া আক্রমণ করে সীমান্ত অঞ্চল থেকে প্রতিপক্ষ সাসানীয়দের হটিয়ে দিতে সক্ষম হন। উত্তর পূর্ব আরবের মুসান্না ইবনে হারিসা ও সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

সাসানীয় বা ইরানীয় সম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিল বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ ককেসাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্কের ও সিরিয়ার অংশবিশেষ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু উপকূলীয় এলাকা। আর বাইজেন্টাইন বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, ইসরায়েল, ফিলিস্তিনি অঞ্চল, লেবানন ও দক্ষিণ তুরস্ক নিয়ে গঠিত ছিল।

উনার ওফাতের পরে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ও উসমান ইবনে আফফান (রা.) এই অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। এসব অভিযানের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য কয়েক দশকের মধ্যে শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

তিনি শুধু জীবিত অবস্থায় নয় মৃত্যুর পরেও সকলের চোখের মনি ছিলেন। ৬৩৪ সালের ২২ আগস্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বিছানায় শায়িতাবস্থায় থাকাকালীন সময়ে উত্তরসূরি মনোনীত করার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেন উনার মৃত্যুর পর মুসলিমদের মধ্যে সমস্যা দেখা না দেয়। অন্যান্য সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে নিয়োগ দেন।

হযরতে ওমর (রা.) যার জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হাইসামি বলেন, আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেছেন,

قال عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان، ووضع علم الأرض في كفة لرجح علم عمر

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, "যদি ওমর ইবনুল খাত্তাব এর জ্ঞানকে এক পাল্লায় রাখা হয় এবং বিশ্ববাসীর জ্ঞানকে আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে ওমরের ইলম (জ্ঞান) ভারী হবে।"

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যদি কোন মানুষকে নবুয়তের দায়িত্ব দিতেন তা হলে তিনি হতেন ওমর।

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

'আমার পরে কেউ নবী হলে ওমর ইবনুল খাত্তাব নবী হতেন।' (মিশকাত : ৬০৩১)

ওমরের সিদ্ধান্তের পক্ষে কোরআনের আয়াত নাজিল হত। বদর-যুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে তাঁর মতামত অধিকতর সঠিক ছিল বলে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিজি ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'ওমরের সিদ্ধান্ত আর অন্য সাহাবিদের ভিন্ন সিদ্ধান্ত সামনে আসলে, ওমরের সিদ্ধান্তের পক্ষে আয়াত নাজিল হয়ে যেত।' বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রায় ১৫টি কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে ওমর (রা.) সম্পর্কে। (ফাতহুল বারী ১/৫০৫)

তিরমিজি শরিফে ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ওমর এমন একজন মানুষ, যার ভেতরে আর বাইরে কোনো পার্থক্য নেই। সে মুখে যে সত্য উচ্চারণ করে, অন্তরেও সে সত্য লালন করে।' অন্য হাদিসে এসেছে এভাবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ওমরের জিহ্বায় সত্য রেখে দিয়েছেন। ফলে তিনি কেবল সত্যই উচ্চারণ করেন' (আবু দাউদ : ১৮৩৪)। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সত্যকে ওমরের মুখে ও অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। (তিরমিজি : ১৭৩৬)

উসমান ইবনে মাজউন (রা.) থেকে ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ওমরের দিকে ইশারা করে বলেন, 'যতদিন ওমর তোমাদের মাঝে থাকবে, ততদিন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। ওমর যখন থাকবে না, তখন চতুর্দিক থেকে তোমাদের মাঝে ফেতনা দেখা যাবে।

হজরত ওমর (রা.) কে দেখলে শয়তান পালিয়ে যেত। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'হে ওমর! আল্লাহর শপথ! তোমাকে পথে দেখলে শয়তান পালিয়ে যায়' (বুখারি ও মুসলিম)। তিরমিজি শরিফে হজরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনায়, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ওমরকে দেখে শয়তানকে পালিয়ে যেতে দেখেছি।

কেয়ামতের দিন প্রথম যে বান্দার হিসাব ডান হাতে দেওয়া হবে সে হচ্ছে ওমর (রা.)। এ কথা শুনে সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আবু বকর (রা.) সম্পর্কে তো কিছু বললেন না। রাসুল (সা.) বললেন, ততক্ষণে আবু বকর জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়তে থাকবে।

ইসলামের ইতিহাসে ওমর (রা.) এক বিশাল অধ্যায়। যার খিলাফত কালীন সময় ছিল ৬৩৪ সালের ২৩ আগষ্ট থেকে ৩ নভেম্বর ৬৪৪ সাল পর্যন্ত। প্রায় শতাধিক সম্রাজ্যে নিয়ে উনি খেলাফত পরিচালনা করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে উনার মত ন্যায় পরায়ণ ,চৌকস এবং সাহসী শাসক আর একজনও পাওয়া যায়না। উনার সাহসী পদক্ষেপে মুসলিম খিলাফতে সংযুক্ত হয় সাসানীয় ও বাইজেন্টাইন সম্রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ এবং ঐতিহাসিক জেরুজালেম ।

আমিরুল মোমেনিন হযরতে ওমর (রা.) এর অধীনে সাম্রাজ্যকে নিম্নোক্ত প্রদেশে বিভক্ত করা হয়:

- আরবকে মক্কা ও মদিনা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়,
- ইরাককে বসরা ও কুফা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়,
- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উচ্চ অংশে আল-জাজিরা প্রদেশ ছিল।
- সিরিয়া ছিল একটি প্রদেশ,
- ফিলিস্তিনকে ইলিয়া ও রামলাহ প্রদেশে বিভক্ত করা হয়,
- মিশরকে উচ্চ মিশর ও নিম্ন মিশর প্রদেশে বিভক্ত করা হয়,
- পারস্যকে খোরাসান, আজারবাইজান ও ফারস প্রদেশে বিভক্ত করা হয়।

প্রদেশের গভর্নরদের প্রতি উনার সাধারণ নসিহত

স্মরণ রেখ, আমি তোমাকে জনগণের উপর নির্দেশদাতা ও স্বেচ্ছাচার হিসেবে নিয়োগ দিই নি। আমি তোমাকে একজন নেতা হিসেবে পাঠিয়েছি। যাতে জনগণ তোমার উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে। মুসলিমদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর যাতে তারা অন্যায়ে পতিত না হয়। তাদের মুখের উপর নিজেদের দরজা বন্ধ কর না। যাতে ক্ষমতাশালীরা দুর্বলদের ধ্বংস করতে না পারে। এবং নিজেকে তাদের চেয়ে উচ্চ মনে হয় এমন কোনো আচরণ কর না। যা তাদের প্রতি স্বৈরাচারী শাসকরা করে থাকে।

হযরত ওমর (রা.) ইসলামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আর উনার খিলাফতকাল ছিল মানুষের জন্য স্বর্ণযুগ। খলিফা থাকাকালে ২৬ জুন ৬৪৪ সালে হযরত ওমর (রা.) মুগীরা ইবনে শুবা-এর খ্রিস্টান ক্রীতদাস আবু লুলুর ছুরিকাঘাতে শাহাদত বরণ করেন।

শাহাদাতের পূর্বে হযরত উমর (রা.) সহ ৬ জন বিশিষ্ট সাহাবি নাম উল্লেখ করেছিলেন (হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) ও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)। পরে পরামর্শক্রমে তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা মনোনীত করার উপদেশ দিয়ে যান। যার ফলে হযরত ওসমান (রা.) পরবর্তী খলিফা মনোনীত হন।

মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী খলিফা হযরতে ওমর ফারুক (রা.) মৃত্যুর পর একটা চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত উসমান জুন্নুরাইন (রা.)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তার আর্থিক সহযোগিতার অবদান ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনী গোত্র উমাইয়া বংশের সন্তান হলেও তিনি নম্র ও লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত ওসমান (রা.) এর প্রসঙ্গে বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীল ব্যক্তি হচ্ছে ওসমান ইবনে আফফান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবিরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।' (তিরমিজি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, ওসমান হলো তাদের একজন– যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কে বন্ধু মনে করেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) ও তাদেরকে বন্ধু মনে করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ওসমানকে এতো ভাল জানতেন যে উনার ও খাদিজা (রা.) মেয়ে হযরতে রুকাইয়া (রা.) কে ওসমানের সাথে বিবাহ দেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুম (রা.) কে বিবাহ দেন। উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন আমার যদি আরও একটি মেয়ে থাকতো তাহলে আমি তাকেও ওসমানের হাতে তুলে দিতাম। বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের কারণে তিনি তিনটি উপাধি পেয়েছিলেন, নম্রতা, সহনশীলতা, আত্মমর্যাদাবোধ, দান ও লজ্জাশীল হযরত ওসমান খলিফা (রা.) হিসাবে ছিলেন অসাধারণ।

৬ নভেম্বর ৬৪৪, ১৭ জুন ৬৫৬ খিলাফতকালীন সময়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে ৬৫০ সালে সাম্রাজ্য ফার্স (বর্তমান ইরান) এবং ৬৫১ সালে খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্তান) এর কয়েকটি অঞ্চল। শ্রীলঙ্কায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সর্ব প্রথম উনিই দূত পাঠিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কাতে। উনার সময়ে ইসলামি খিলাফত রাষ্ট্রের পরিধি ছিল পশ্চিম থেকে পুরো মরোক্কো, দক্ষিণ-পূর্ব তথা বর্তমান পাকিস্তান পর্যন্ত এবং উত্তর আমেরিকা থেকে আজারবাইজান পর্যন্ত।

উসমান (রা.) এর রাজত্বকালে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামিক নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উনার রাজত্বকালে তিনি প্রশাসনিক বিভাগ সমূহ কে সংশোধন করেছিলেন এবং অনেক জন-প্রকল্প কে তিনি প্রসারণ করেছিলেন, অনেক প্রকল্প কে সম্পূর্ণ করেছিলেন নিজের রাজত্বকালেই।

হজরত ওমর (রা.) ইসলামী খিলাফতের সম্প্রসারণে যে অভিযান শুরু করেছিলেন, হজরত ওসমান (রা.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে তা এগিয়ে যেতে থাকে। তাঁর সময় ইসলামী খিলাফত-পূর্বে কাবুল ও বেলুচিস্তান এবং পশ্চিমে ত্রিপলী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তাঁর সময়ই প্রথম নৌবাহিনী গঠিত হয়। নৌ-অভিযানে সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপপুঞ্জ মুসলমানদের অধিকারে আসে। তাঁর সময়ই বাইজান্টাইন ও পারস্য শক্তির ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হয়।

হজরত ওসমান (রা.) বিশ্ব মুসলিমের জন্য সব থেকে বড়ো যে অবদানটি রেখে গেছেন, তা হলো পবিত্র কোরআন সংকলন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে কোরআন পাঠে ভিন্নতা লক্ষ করে একটি নির্ভুল সংস্করণ তৈরির উদ্যোগ নেন। একটি উপযুক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে হজরত হাফসার (রা.) কাছে সংরক্ষিত কোরআনের কপিকে মূল ধরে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করে এর কপি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং মানুষের কাছে থাকা কোরআনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সংগ্রহ করে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলেন। কিন্তু তার সরলতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী চক্র ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার বিরোধ, কুরাইশ-অকুরাইশ দ্বন্দ্ব, মুহাজির-আনসার সম্প্রীতি বিনষ্ট, অমুসলিমদের বিদ্বেষ ইত্যাদি কারণে মুসলিম সাম্রাজ্যে এক চরম সংঘাতময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। ৬৫৬ সালের ১৭ জুন হিজরি ৩৫ সনের ১৮ জিলহজ শুক্রবার আসরের নামাজের পর ৮২ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ খলিফাকে অত্যন্ত বর্বরভাবে শহীদ করা। হত্যাকারী একজন মিশরীয় বিদ্রোহী ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) ১২ দিন কম ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত উসমানের (রা.) শহীদ হওয়ার পর মদিনার সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। পাঁচ দিন যাবত রাজনৈতিক ডামাডোলের পর, মিসরীয় বিদ্রোহীদের নেতা, ইবনে সাবা, হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে মতামত প্রদান করেন। ২৩শে জুন ৬৫৬ সালে, হযরত উসমানের (রা.) মৃত্যুর ছয় দিন পর, হযরত আলী (রা.) চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন এবং জনগণ তাঁর হাতে একে একে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

হযরত আলী (রা.) এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাহসিকতা, নেতৃত্ব, আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা, বাগ্মিতা, ন্যায়বিচার এর এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্ আমাকে অবগত করেছেন যে চারজন ব্যক্তিকে তিনি ভালোবাসেন। আর আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমিও যেন তাঁদেরকে ভালোবাসি।' সবাই ঐ ব্যক্তিদের নাম জিজ্ঞেস করলে, এর উত্তরে পর পর তিনবার তিনি "প্রথম আলী (রা.) অতঃপর সালমান (রা.) আবুযার (রা.) ও মিকদাদের (রা.) নাম উচ্চারণ করেন।" (সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, ৬৬ নং পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أنا مدينة العلم و عليّ بابُها فمن أراد المدينة فليأت الباب

"আমি জ্ঞানের শহর ও আলী তার দ্বার এবং যে কেউ শহরে প্রবেশ করতে চাইলে দ্বার দিয়েই প্রবেশ করবে।"

রাসুল (সা.) আরও বলেছেন,"যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসে সে যেন আমাকেই ভালোবেসেছে, আর যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার সঙ্গেই শত্রুতা পোষণ করেছে।"

লেখক: সভাপতি, ইউথ মুসলিম এসোসিয়েশন, পর্তুগাল।

আমি মুসলিম হওয়ার পর আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন

আলিয়া উম্মে রাইয়ান

আমার জন্ম, বড়ো হওয়া সবই ইস্ট লন্ডনে। আমি যেখানে জন্মেছি, সেখানে মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশি এলাকা হিসেবেই স্থানটি পরিচিত। তাই আমি ছোটবেলা থেকেই মুসলিমদের দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমার বাবা-মা দুজন দু দেশের মানুষ। আমার মা ছিলেন ইতালির আর বাবা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার। কিন্তু কেউ যখন আমার পরিচয় জানতে চায়, আমি সরলভাবে বলি, "আমি আলিয়া আর আমি এমন এক মানুষ যে কেবল আল্লাহর পথেই অভিযাত্রী হতে চায়।"

আমি একজন খ্রিষ্টান হিসেবেই জন্মেছিলাম। বুদ্ধি হওয়ার পর আমি আবার খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হই। আমি সবসময়ই একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম। আমার মা আমাকে এমনভাবে বড়ো করেছিলেন যে, আমি সবসময়ই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়াতাম। আমি সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন করতাম, বারবার করতাম। আমি যখন বেশ ছোট তখনই খ্রিষ্টান ধর্মের অনেকগুলো মৌলিক বিষয় নিয়ে আমার মাঝে প্রশ্ন জেগেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি আবেগের জায়গা থেকে হয়তো একটি ধর্ম মানছি কিন্তু আমার ভেতরকার যুক্তিবোধ ও প্রজ্ঞা আমাকে তা মানতে দিচ্ছে না। তাই আমি খ্রিষ্টান ধর্ম অনুশীলন থেকে বেরিয়ে আসি।

আমার বাবার ধর্ম বা বিশ্বাস ছিল খুবই অদ্ভুত। আমার বাবা মুসলিম হিসেবেই জন্মেছিলেন। কারণ আমার দাদা মুসলিম ছিলেন। কিন্তু আমার জন্মের বহু আগেই আমার বাবা ইসলাম ধর্ম পালন করা ছেড়ে দেন। তাই তিনি যখন লন্ডনে আসেন বা আমার মায়ের সাথে পরিচিত হন, তখন তিনি মুসলিম ছিলেন না। আমিও তাই জন্মসূত্রে মুসলিম কোনো পরিবেশ পাইনি।

আমার মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় একদম শৈশবে যখন আমি মায়ের সাথে চার্চে যেতাম। আমি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো মানসিকতা নিয়েই চার্চে যেতাম কিন্তু যাওয়ার পর আমার ভালো লাগতো না। কোন যুক্তিতে আমরা ঈশ্বরপুত্রের উপাসনা করছি আমি তাও বুঝতে পারতাম না। কিংবা এখন হয়তো তিনি ঈশ্বরপুত্র হিসেবে চিত্রায়িত হচ্ছেন আবার একটু পর তিনি নিজেই আবার ঈশ্বর বনে যাচ্ছেন– এগুলো আমার কাছে খটকা লাগতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তাই আমি নিজে একজন মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষের উপাসনা করবো– এ বিষয়টি আমার কাছে কখনোই যৌক্তিক মনে হয়নি।

একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। আমি চার্চের এক যাজকের কাছে আমার এ প্রশ্নগুলোই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেননি। বরং বলেছিলেন, 'এত কথা না ভেবে শুধু বিশ্বাস করে যাও।' ঐ দিনের ঐ একটি লাইনেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম এ ধর্ম আমার জন্য নয়।

আমি ইসলামের কথা জানতে পারি আমার শৈশবের চেনা এলাকা থেকেই কারণ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল মুসলিম। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বাংলাদেশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। আমার বয়স তখন ৮ বছর। আমি লিভিং রুমে থাকতাম। আমার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই রাস্তার অপর প্রান্তে একটি মসজিদ দেখা যেতো। এটি ছিল মেকশিফট একটি মসজিদ বা স্থানীয় পর্যায়ে

নামাজ আদায়ের জন্য বানানো একটি স্থান। দেখতে অনেকটা কন্টেইনারের মতো। আমার জানালা দিয়ে পরিষ্কারভাবে নামাজের স্থানটাও দেখা যেতো। আমি দেখে মুগ্ধ হতাম। আমি প্রতিদিন মুসলিমদের মসজিদে প্রবেশ করতে দেখতাম। তারা সেখানে রুকু দিতেন, সিজদা দিতেন। এগুলো দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যেতো। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় আমি এ দৃশ্যগুলো দেখতে জানালার কাছে ছুটে যেতাম। আমার নিজের বাসার পরিবেশ তখন খুব একটা ভালো ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হতো। একদিনের কথা আজও মনে পড়ে। সেদিন তাদের দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছিল। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম আমার বেডরুমে। আমার বয়স তখন মাত্র ৮ বছর। বেডরুমে যাওয়ার পথে আমার মায়ের একটি শাল আমার চোখে পড়ে। এই শালটি আমার মায়ের এক পাকিস্তানী সহকর্মী তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল।

আমি শালটা নিয়ে চলে যাই আমার বেডরুমে। শালটাকে মেঝের ওপর ফেলে অন্য কোনো নিয়মকানুন না জেনেই আমি সিজদায় পড়ে যাই। আমি সিজদায় আল্লাহকে একটা কথাই বলেছিলাম, 'হে আল্লাহ আপনি আমার বাবা-মায়ের ঝগড়া থামিয়ে দিন।' নিয়ম না জানলেও আমি মসজিদে অন্যান্য মুসল্লীদের যেভাবে দেখেছিলাম সেভাবেই সিজদা দিয়েছিলাম। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, আল্লাহ আমার কথা শুনবেন। কারণ আমি সিজদায় গিয়ে তার সাথে কথা বলেছি। এই প্রথম আমি আমার রবের এত কাছে গিয়েছিলাম, তাঁর সাথে কথা বলেছিলাম। এটিই ছিল ইসলামের সাথে আমার প্রথম পরিচয়।

এর পরের ঘটনাটি ঘটে দুই বছর পর। তখন আমি ১০ বছরের একটি মেয়ে। আমি একদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে শুনি, আমার স্কুলের আমারই ক্লাসের একজন মুসলিম ছাত্রী প্লেইং কার্ড কিনতে যাওয়ার পথে রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছে। আমাদের স্কুল এ মর্মান্তিক ঘটনায় শোক জানায়। আমাদের সবার বাসায় চিঠি পাঠায় এবং দুর্ঘটনায় নিহত মেয়েটির জানাজা ও দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা জানায়। আমি আমার মাকে খুব অনুরোধ করে সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমার এক মুসলিম বান্ধবী ছিল। ওর নাম লায়লা। ও সোমালিয়া থেকে এসেছিল। ওর কাছ থেকে একটি স্কার্ফ নিয়ে আমি প্রথমবারের মতো ইস্ট লন্ডন মসজিদে যাই। আমার ধারণা ঐ জানাজায় আমিই একমাত্র অমুসলিম ছিলাম। আমি মসজিদে সবার সাথে জোহরের নামাজে অংশ নেই। জোহরের পর জানাজাতেও শরীক হই। এবারও জোহর নামাজ পড়তে গিয়ে সিজদার সময় আমি অনুভব করি, আমি আল্লাহর কাছাকাছি চলে গিয়েছি; ঠিক যেমনটা দুই বছর আগে আমি আমার বেডরুমে অনুভব করেছিলাম। এটিই ছিল ইসলামের সান্নিধ্যে আমার দ্বিতীয় ঘটনা।

কিন্তু আমি যতই ইসলামের কাছাকাছি চলে যাচ্ছিলাম, আমার বাসার পরিবেশ ততটাই প্রতিকূল হয়ে পড়ছিল। আমার বাসায় তখন সাংসারিক ঝগড়া এমনকী মারামারি লেগেই থাকতো। আমি মানসিকভাবে সেখানে মোটেও স্বস্তিবোধ করতাম না। সুবহানআল্লাহ, আল্লাহ তখন আমার সহযোগিতায় একজনকে আমার জীবনে পাঠিয়ে দেন। তখন আমি সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ি। আমার একজন সহপাঠীনি ছিল। সে ছিল খুবই ভালো প্র্যাকটিসিং মুসলিম। আমার ক্লাসে আরও কয়েকজন মুসলিম মেয়েও ছিল। তবে তারা ছিল গতানুগতিক। কিন্তু ঐ মেয়েটি ছিল একদমই আলাদা এবং ভীষণভাবে ধার্মিক। তার বাসায় তৎকালীন সময়ে আমার বাসার চেয়েও অনেক বেশি সমস্যা চলছিল। তার মা নিয়মিত শারীরিকভাবে নির্যাতিত হতো। কিন্তু এত কিছুর মাঝেও সে ছিল শান্ত ও স্বাভাবিক। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তোমার বাসার পরিস্থিতি তো আমার চেয়েও খারাপ। আমি তো এটুকুতেই হাঁপিয়ে গিয়েছি, ভেঙে পড়েছি। তুমি কীভাবে এতটা স্বস্তিতে থাকতে পারছো? সে উত্তরে বলেছিল, "আমার ঈমান আমাকে ভালো রেখেছে।"

এটি ঠিক যে, আগে থেকেই ইসলাম সম্পর্কে আমার কিছু জানাশোনা ছিল। তবে ইসলামকে আমি বরাবরই অনগ্রসর একটি ধর্ম বলেই জানতাম। কিন্তু আমার সেই ধার্মিক বান্ধবীর জন্য আমার ভেতর ভালোবাসা জন্মেছিল। মানুষ হিসেবে আমরা দুজন ছিলাম একদমই আলাদা। আমি ছিলাম একটু পাগলাটে স্বভাবের, একটু বেপরোয়া, বেশ বহির্মুখী। অন্যদিকে সে ছিল ধার্মিক। তারপরও আমাদের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তখন থেকেই আমি ইসলামকে জানার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝেই ইসলামী আর্টিকেল পড়তাম। আমি ধর্মীয় ক্যাসেট শুনতাম। ক্লাসেও আমরা দুজন কুরআন তেলাওয়াত করতাম। বলতে দ্বিধা নেই, আমি কুরআন পড়তাম এর ভুল ও সাংঘর্ষিক অবস্থান বের করার জন্য। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কুরআনে ভুল খুঁজে পেলে আমি আমার প্রিয় বান্ধবীকেও এ ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো। তাছাড়া আমি মনে করতাম, হিজাব পরিধান করার বিধানটি ভুল। এটি মুসলিম নারীদেরকে সফল জীবন বা সফল ক্যারিয়ার থেকে অনেক দূরে রাখে। কেননা, আমি একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বড়ো হওয়ার কারণে আমি অনেক সময় দেখেছি যে, স্বামীরা সামনে হাঁটে আর তাদের স্ত্রীরা অনেকটা পেছনে থেকে তাদেরকে অনুসরণ করে। এসব স্মৃতি আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে একটি অনগ্রসর ধারণা তৈরি করেছিল।

আমার ইসলাম সম্বন্ধে তখন দু ধরনের পর্যবেক্ষণ ছিল। একদিকে মনে হতো, ইসলামের অনুশীলন আমার বান্ধবীকে শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করছে। অন্যদিকে, আমার এমনও মনে হতো যে, এই ইসলামই আমার বান্ধবীকে আঁটকে রাখবে, তার এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। এসব বিষয় নিয়ে আমার বান্ধবীর সাথে আমার নিয়মিত কথা হতো। আমরা বিতর্ক করতাম। কিন্তু সময় যত যায়, আমি তার সাথে ততটাই যেন একমত হয়ে পড়ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে ইসলামই একমাত্র সত্য ও সঠিক ধর্ম। এই উপলব্ধি আসার পর আমার মন, অন্তর ক্রমশই পাল্টে যাচ্ছিল। যে ভুল খোঁজার জন্য কুরআন পড়ছিলাম কার্যত আমি

সেই ভুল পাইনি। বরং আমি কেবলই অনুধাবন করছিলাম যে, ইসলামই হলো একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আমি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একের পর এক বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদিও পাচ্ছিলাম। কুরআনের ভাষাগত মুজেজাও আমায় মুগ্ধ করছিল। আর এই উপলব্ধি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। কারণ আমি আমাকে চিনি। আমি যদিও তখন বয়সে অনেকটাই কম। কিন্তু আমি জানতাম, যদি আমি কোনো কিছুকে সত্য বলে চিনতে পারি তাহলে তার জন্য নিজের দিক থেকে শুধু ১০০ ভাগ নয় ১৫০% দেওয়ার জন্যই আমি প্রস্তুত। আমি আরও বুঝতে পারছিলাম যেহেতু কোনো বলপ্রয়োগে নয়, বরং আমি সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবেই ইসলামকে বুঝেছি এবং আমার মনও তাতে সায় দিচ্ছে, তাই আমার জীবনের গতিপথকেও এখন সেভাবেই পাল্টে নিতে হবে।

কিন্তু এ পথে যেতে আমার ভীষণ ভয় লাগছিল। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল সেই দিনগুলো। আমি ঐ পরিস্থিতির চাপ আর নিতে পারছিলাম না। দম বন্ধ হওয়া সেই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার এতদিনের সব পঠিত আর্টিকেল, ক্যাসেটগুলো ফেলে দিয়েছিলাম। বন্ধুদের থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। এমনকী কুরআন পড়া বন্ধ করে দিলাম। পরিবর্তনটাকে আমি আসলে খুব ভয় পাচ্ছিলাম। এমনটা নয় যে, আমি আমার পুরনো জীবনটাকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু সেই জীবনে আমি মুক্ত, স্বাধীন এবং যে কোনো ধরনের বাঁধা থেকে মুক্ত ছিলাম। ইসলাম মানতে শুরু করলে আমার সেই স্বাধীনতায় লাগাম টেনে ধরতে হবে– এমনটা আমার মনে হচ্ছিল। তাই আমার দিক থেকে ভয় পাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। আমার ফেলে আসা জীবন বা সেই সময়ের অর্জনগুলো তো আমার জানাই ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর আমার জীবনটা কেমন হবে তা আমি জানতাম না। তাই নানামুখী ভয় আমাকে ঘিরে ধরেছিল।

যাই হোক, আমি সবকিছু বাদ দিয়ে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম। এরই মধ্যে আমার পরীক্ষার সময় চলে আসলো। আমি রিভিশন দিচ্ছিলাম। কিন্তু কেন যেন আমি পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। আমার মাথায় কেবলই ইসলামের নানা বিষয় চলে আসছিল। বিগত কয়েক মাস আমি যা পড়েছিলাম সেগুলোই আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। বিজ্ঞানময় কুরআন, আল্লাহর অস্তিত্ব, নবুওয়াতের সত্য সব প্রমাণ– এগুলো বারবার আমার মনে চলে আসছিল। আমি একদমই পড়তে পারছিলাম না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাধ্য হয়ে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি হাঁটতে বের হয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তায় সিগনালে সবুজ বাতি জ্বলে ওঠার পরও আমি হাঁটতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল, কেউ বোধহয় আমার পা দুটো রাস্তার সাথে পেরেক দিয়ে আঁটকে রেখেছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, আমার ভেতর যে বিশ্বাসগুলো জন্মেছে বা যে সত্যগুলো আমি জেনেছি– সেগুলো অব্যক্ত রেখেই যদি আমি রাস্তা পার হতে গিয়ে আমারই ঐ বান্ধবীর মতো গাড়ির ধাক্কায় মরে যাই তাহলে আমার পরিণতি কি হবে? এত সত্য জেনেই বা কি লাভ হলো? তখনই আমার ভেতর ভাবনার উদ্রেক হলো। যে সত্যকে আমি জেনেছি তা কেন আমি ঘোষণা করছি না? কেনই বা সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারছি না? আমি সাথে সাথে আমার বান্ধবীকে ফোন দিলাম। মাঝে বেশ কয়েকদিন যেহেতু আমি কারো সাথেই যোগাযোগ রাখিনি, তাই আমার ফোন পেয়ে সে খুবই খুশি হলো। আমি তাকে বললাম, আমি শাহাদাহ পাঠ করতে চাই। এটি ছিল রোববারের ঘটনা। পরের দিন অর্থাৎ সোমবারই আমি কালেমায়ে শাহাদাহ পাঠ করি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার পরিবারের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই মারাত্মক। সে সময়ে আমার বয়স কম ছিল। মানুষ হিসেবে আমি বরাবরই একটু সাহসী, আবেগী এবং বেপরোয়া ছিলাম। শাহাদাহ পাঠ করেই আমি হিজাব পরিধান করে আমার বাসায় যাই। এটি হয়তো বা সঠিক উপায় ছিল না। আরেকটু নমনীয় কোনো কৌশল অবলম্বন করলে ভালো হতো কিনা আমি জানি না। দরজা খুলেই মা আমাকে হিজাব পরিহিত অবস্থায় দেখে একদমই ঘাবড়ে গেলেন। তখন আমিই তাকে বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। আমি মুসলিম হয়েছি।' তিনি মনে করেছিলেন, এটি আমার সাময়িক একটি অনুভূতি। আলহামদুলিল্লাহ, সাময়িক সে অনুভূতির ২৪টি বছর এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে। ইসলাম গ্রহণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমি আমার পরিবারকে হারিয়ে ফেলি। বন্ধুদের হারাই। হুট করে খুব অল্প বয়সেই আমি যেন সঙ্গহীন একজন মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম।

মুসলিম হওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল। আমার মায়ের সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। ঐ সময়টায় আমার জীবনে আরও বড়ো কিছু ঘটনাও ঘটে যায়। আমার মা নতুন একটি সম্পর্কে জড়িয়ে যান। ঐ লোকটি আবার ইসলাম ও মুসলিমদের প্রচণ্ড ঘৃণা করতো। সে আমার মাকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। এরপর আমার বয়স যখন ১৭ বছর হলো, তখন সেই দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটলো। আমার মা একদিন এসে আমাকে বললো, "আমি তোমার জন্য যথেষ্ট করেছি। এখন আর তোমার মা হয়ে থাকার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। এখন থেকে তোমাকেই তোমার দায়িত্ব নিতে হবে।'

আমার জন্য এটি খুবই ভয়ংকর একটি সময় ছিল। কারণ ঐ বয়সটায় সবাই পরিবারের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে চায়। অথচ এমনই একটি সময়ে মা নিজেই যদি সন্তানকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হয় না। কিন্তু কষ্ট যতই হোক জীবন তো চালাতে হবে। তাই সে বয়সেই আমি চাকরি খোঁজা শুরু করি। কারণ একা থাকতে গেলে খরচ তো লাগবেই। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও আমি তখন বেশ কিছু সমস্যায় পড়ে যাই যা পরিবারের সহায়তা ছাড়া কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে কঠিন মুহূর্তেও আমি আসলে কাউকেই পাইনি। ফলে, একা একাই আমাকে সে কঠিন পথগুলো পাড়ি দিতে হয়।

এখানে বলা দরকার, আমি মূলত একটি কট্টরগ্রুপের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। একটি পর্যায়ে আমি তা ছেড়ে দিয়ে আরেকটি গ্রুপে যাই। কিন্তু তারাও বেশ কট্টর ছিল। তাই আমার ও পরিবারের এ কঠিন বিপর্যয়ের সময়ে আমি আসলে কোথাও গিয়েই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমি তখন একটি ক্রান্তিকালের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সদ্য মুসলিম হওয়ার কারণে পরিচয়ের একটি সংকট তো ছিলই। তার ওপর পরিবার থেকে প্রত্যাখাত হওয়া, কিংবা যে মুসলিম গ্রুপগুলোর সাথে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম– তারাও কেউ আমার অবস্থা বুঝতে পারছিল না। আমি খুব বেশি একাকী হয়ে পড়েছিলাম। আমার সেই দুর্বিষহ অবস্থাটি এতটাই প্রকট ছিল যে, আমি অসুস্থ হয়ে যাই। একটি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি হতে হয়। হাসপাতালের বেড থেকেই আমি মাকে ফোন দিয়ে বলি, 'তুমি এসে আমাকে বাসায় নিয়ে যাও।' এরপর থেকে আমি ইসলামের অনুশীলনও বন্ধ করে দেই। আমি হিজাব খুলে ফেলি। নামাজ ছেড়ে দেই। মুসলিমদের থেকেও দূরে থাকতে শুরু করি। কিন্তু আমার মনের ভেতর বিশ্বাসের জায়গাটা তখনও ঠিক ছিল। বিশ্বাসের জায়গা থেকে আমি ইসলামকে ধারন করতাম। আমার ধারনা, এমনটা হয়েছিল কারণ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম কোনো আবেগ থেকে নয়, বরং যৌক্তিকভাবে। যুক্তি, বিবেচনাবোধ আর প্রজ্ঞার সাথে শতভাগ একমত হয়েই আমি ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম।

আমার ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাও বেশ ভিন্নরকম। আমি মায়ের কাছে আমার মতো করেই ছিলাম। কিন্তু তখনই আমার একটি চাকরি হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমাকে বাসা থেকে অন্যত্র চলে যেতে হয়। সেখানে আমি ভালোই ছিলাম। মুসলিম হওয়ার পর পর প্রাথমিকভাবে আমাকে যেসব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়েছিল সেগুলো থেকেও আমি মুক্ত ছিলাম। এরপরও মনের গহীনে কোথাও গিয়ে আমি প্রচণ্ড শূন্যতা অনুভব করতাম। এ শূন্য অনুভূতি সাথে নিয়েই আমি কয়েক বছর অতিবাহিত করেছিলাম। আমার জন্য এ শূন্যতাটি খুব বেশি কষ্টকর অনুভূত হচ্ছিল। কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম, যে জীবনটা আমি যাপন করছি তা আমার মনের চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি তাই আবারও ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ফিরতে শুরু করলাম।

এখানে কিছু অনুভূতির কথা আলাদা করে বলা দরকার। শাহাদাহ ঘোষণায় অনেক বেশি স্বস্তিবোধ হয়– এটি কয়জন দাবি করেছে আমি জানি না। কিন্তু ইসলামের দিকে আবারও ফিরে আসায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিপুল পরিমাণ সুখ রয়েছে। বিশেষ করে, এ ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি যদি কোনো সংগঠন বা গ্রুপের চাপে না হয়, কিংবা কেউ কানের কাছে এসে বারবার ইসলাম গ্রহণের কথা বলছে এমনটা যদি না হয়, কিংবা কেউ সবসময় আপনাকে হালাল ও হারামের কথা বলে পীড়া দিচ্ছে– এমনও না হয়; অর্থাৎ একদমই সহজাতভাবে নিজের ভেতরের বোধ থেকে যখন কেউ পুনরায় আল্লাহর পথে ফিরে আসে, তার যে কি আনন্দ, কতটা স্বস্তি, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমি এরপর আবারও একটু একটু করে ইসলামের অনুশীলন শুরু করলাম। প্রাথমিকভাবে, প্রতিদিন আমি এক পাতা করে অর্থসহ কুরআন পড়তে শুরু করলাম। মাথায় আবারও হিজাব পরিধান করলাম। আমি আবার নামাজ শুরু করলাম। ইসলামে ফিরে আসার চেয়ে মধুর অনুভূতি দ্বিতীয়টি আর নেই। কারণ এ সম্পর্কটি একদমই আমার সাথে আমার রবের।

এদিকে, আমার মায়ের সাথে ঐ লোকটির সম্পর্কও ভেঙে গেলো। আমার মা সে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলেন। আমিও তার সাথে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করতে শুরু করলাম। তার দিক থেকেও এবার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল যাতে আমাদের সম্পর্কটি জোড়া লেগে যায়। আমরা নানা বিষয়ে কথা বলতাম। অবশেষে, ২০১৫ সালে এসে আমার মা প্রথমবারের মতো আমাকে ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমি তখন চাকরিসূত্রে উত্তর আফ্রিকার একটি দেশে থাকতাম। আমার মা সেখানেও মাঝে মধ্যে গিয়ে আমাকে ধর্ম সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করতেন। আমার মা আগাগোড়াই ছিলেন প্রচণ্ড আগ্রহী পাঠক। বই কেবল তিনি পড়তেন না, রীতিমতো যেন গ্রোগ্রাসে গিলতেন। তিনি ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতেন। ইসলামের ইতিহাস নিয়েও তার অদম্য কৌতুহল ছিল।

২০১৫ সালেই তিনি আমাকে জানান যে তিনি মুসলিম হতে চান। এর কিছুদিন পর তিনি শাহাদাহ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এর কয়েকমাস পর তিনি আবার আমাকে জানান যে, তিনি ঈমান ধরে রাখতে পারছেন না। আমার মনে হয়, তার ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছিল কয়েকটি কারণে। প্রথমত, তার বয়স। তাছাড়া তিনি তার আশপাশে ভালো কোনো মুসলিম সঙ্গী বা সঙ্গীনিও পাননি। আমি নিজেও তার থেকে তখন অনেক দূরবর্তী স্থানে থাকতাম।

যাই হোক, আমার মা একটি সময়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যান। এরপর ২০২১ সালে এসে আবার একটি ঘটনা ঘটে। তখন তিনি প্রচুর ইউটিউব ভিডিও দেখতেন। তিনি আমাকে জানান, তিনি আয়েশা প্রাইম নামের একজন মহিলার ভিডিও দেখছেন এবং তার ভালো লাগছে। তখনো পর্যন্ত আমি এই আয়েশা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। তাকে চিনতামও না। তাই আমি তাকে নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করি। জানতে পারি, তিনি আমেরিকায় বসবাসকারী একজন মুসলিম বোন। ঐ আয়েশার ভিডিও দেখতে দেখতে আমার মা লিংক পেয়ে যান শায়খ খালেদ ইয়াসিনের। শায়খের ভিডিও তাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার মা বলতেন, 'এ লোকটাকে আমি চিনি না। কিন্তু তার কথাগুলো একদম আমার অন্তরকে স্পর্শ করে যায়। এ লোকটি প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। ইতিহাস সম্বন্ধেও তার ভালো জানাশোনা আছে।' আমার কাছে এসে মা বারবার শুধু শায়খের প্রশংসাই করতেন। একের পর এক ভিডিও দেখতেন তিনি। নানা বিষয়ে শায়খের আলোচনায় তিনি যেন নতুন কিছু খুঁজে পেতেন আর আমার কাছে এসে সেই উচ্ছাস প্রকাশ করতেন। আমি ইচ্ছে করেই তাকে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতাম না। আমি ধৈর্য

ধারন করে ছিলাম। তবে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, তার ভেতর পরিবর্তনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

এরপর আমি সক্রিয় হই। শায়খ খালিদ ইয়াসিনকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি নানাভাবে চেষ্টা শুরু করি। আমার যারা পরিচিত ছিলেন, সবাইকেই আমি মেসেজ পাঠাই। তাদের কাছে জানতে চাই, খালেদ ইয়াসিন কোথায় থাকেন এবং তার সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় আছে কিনা? আমার পরিচিত একজন শায়খের ফেসবুক পেইজের লিংক আমাকে পাঠায়। আমি সেই পেইজে গিয়ে তার নাম্বার ও ইমেইল এড্রেস পেয়ে যাই। আমি তাকে মেইল করি। সেখানে লিখি, "আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমার মা আপনার খুব ভক্ত। আমার মায়ের পুরনো সব ইতিহাস আমি তাকে লিখি। আমার ইসলাম গ্রহণসহ আমার পরিবারের পেছনের ঘটনাও তাকে লিখি। সবকিছু বিস্তারিত লেখার পর আমি তাকে অনুরোধ করি, যদিও আপনি খুব ব্যস্ত তারপরও খুব ভালো হতো যদি আপনি কোনোভাবে আমার মায়ের সাথে একটিবার কথা বলতেন।'

আমার ধারনা ছিল, তিনি হয়তো আমার মেইল পাবেনই না। তাছাড়া তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, মেইল চেক করার মতো সময়ও তার হওয়ার কথাও নয়। আমি কি মনে করে তাকে মেইল দিয়েছিলাম জানি না। আমার ধারনা ছিল, যেহেতু আমি তার কনটাক্ট লিস্টে নেই, তাই আমার মেইল হয়তো তার ইনবক্সেই যাবে না। স্পাম বা জাংকে গিয়ে পড়ে থাকবে। তার দিক থেকে কোনো রেসপন্স বা ফিরতি মেইল পাওয়ার কোনো আশাও আমার ছিল না। কিন্তু আমাকে চমকে দিয়ে আমার মেইল পাঠানোর ২০ মিনিটের মাথায় তিনি আমাকে ফিরতি মেইল পাঠান এবং বলেন, আমার মায়ের সাথে কথা বলতে পারলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন।

এরপর আমরা ফোনে কথা বলি। আমি শায়েখকে আবারও আমার ব্যক্তিগত জীবন, আমার মায়ের জীবন, মায়ের অতীত, তার সাম্প্রতিক কৌতুহল, ইসলাম নিয়ে তার আগ্রহ, তার মাথায় জন্ম নেয়া সব প্রশ্ন, রাসুল (সা.) এর প্রতি তার ভালোবাসা-সবকিছুই শায়েখকে জানিয়ে দেই। যাতে শায়খ তার সাথে প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে পারেন। শায়েখ সবকিছু শুনে আমায় প্রশ্ন করেন, "তোমার মায়ের নাম কী?' আমি বললাম, আমার মা একজন ইতালীয় এবং তার নাম জোসেফিন।' শায়খ উত্তরে বলেছিলেন, 'তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, আমার মায়ের নামও জোসেফিন। তার বয়স এখন ৯০ বছর। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা জোসেফিন যখন ক্রমাগত দুনিয়া ছাড়ার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তেই তোমার মা জোসেফিন হয়তো নতুন এক দুনিয়ায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে।'

শায়খ আমাকে বললেন, 'যদিও তুমি চাইছো আমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলি। আমি তা বলবো তবে একটু ভিন্নভাবে। তুমি আমার নাম তাকে বলো না। যদিও তিনি আমার ভিডিও পছন্দ করেন, তারপরও তিনি সরাসরি আমাকে এভাবে দেখে বিব্রতও হতে পারেন। তুমি বরং তোমার মাকে বলবে একজন তার গবেষণার অংশ হিসেবে তোমার সাথে কথা বলতে চায় এবং তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়।' আমি আমার মাকে তাই বললাম। তিনি সানন্দে রাজি হলেন। একটি জুম মিটিং হলো। আমিও সেই মিটিংয়ে ছিলাম। তবে কথা বলিনি। তাদের মিটিংটা অসাধারণ ছিল। শায়েখ এতটাই সুন্দরভাবে পুরোটা সেশন পরিচালনা করেছেন, সুবহানআল্লাহ। তিনি ভিডিও অফ করে কথা বলেছিলেন। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, মা তার এত ভিডিও শুনেছেন, কিন্তু তিনি শায়েখের কণ্ঠ চিনতে পারেননি। প্রথম বৈঠক শেষে যখন শায়েখ খালেদ ইয়াসিন নিজের পরিচয় ফাঁস করে দেন, আমার মা বিস্মিত হন। আনন্দে অভিভূত হয়ে তিনি নিজের আবেগ প্রকাশ করতে থাকেন। এরপর শায়েখ আমার মায়ের সাথে আরও কয়েকটি জুম সেশন করেন। এরপর আমার মা দ্বিতীয়বারের মতো শাহাদাহ পাঠ করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

অনেকেই প্রশ্ন করে হিজাব পরিধান করার কারণে আমার স্বাধীনতা কী ক্ষুন্ন হয়েছে কিনা? প্রকৃত সত্য হলো, হিজাব পরিধান করার পর থেকে আমি আমার স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে শিখেছি। স্বাধীনতা কী তা অনেকেই বোঝে না। প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মাধ্যমে আরোপিত শিকল ভেঙে বেড়িয়ে আসা। যখন আপনি আপনার রবের সাথে সম্পর্কে যুক্ত হয়ে যাবেন, জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে শিখবেন, মানুষের বানানো বিধান ছেড়ে আল্লাহর দেওয়া বিধান মানতে পারবেন, তখনই আপনি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমি হিজাব পরিধান করছি। অনেক আইন আমাকে মানতে হচ্ছে, আবার অনেক কিছু আমি করতেও পারছি না। তারপরও আমি স্বাধীন। কারণ আমি অন্য কারো তৈরি করা আইন মানছি না। বরং আমি এমন এক সত্তার দেওয়া আইন মেনে চলছি, যিনিই আমাকে তৈরি করেছেন, আমাকে শারীরিক কাঠামো ও মানসিক অনুভূতি দান করেছেন এবং কীভাবে আমার কল্যাণ হবে– তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।

যেসব অমুসলিম মনে করে তারা স্বাধীন অথবা আমরা মুসলিমরা বোকার রাজ্যে বাস করছি, তারা আসলে ভুলের মধ্যে আছেন। কেননা, তারা বুঝতেই পারছেন না যে, তারা নিজেরাই অন্য কারো বা অন্য কোনো কিছুর দাস হয়ে আছে। আমরা সবাই কোনো বিশেষ কারণেই যে কোনো কাজ করি। আমরা সকাল বেলা উঠে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যাই; এর নেপথ্যেও কারণ আছে। হয়তো আমরা পরিবারের জন্য এমনটা করছি। অথবা বাবা মায়ের জন্য করছি। কিংবা ক্যারিয়ারের জন্য, অথবা সম্পদ উপার্জনের জন্য। কিন্তু আমি ভালো আছি কারণ আমি এমন এক সত্তার কথা মেনে সব কিছু করছি যিনি উৎকৃষ্ট, নিখুঁত এবং পরিপূর্ণ। আমি এমন একজনের দাসত্ব করি যিনি আমাকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং যার কাছে আবারও আমাদের ফিরে যেতে হবে।

অনেকেই প্রশ্ন করে হিজাব পরিধান করার কারণে আমার স্বাধীনতা কী ক্ষুন্ন হয়েছে কিনা? প্রকৃত সত্য হলো, হিজাব পরিধান করার পর থেকে আমি আমার স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে শিখেছি। স্বাধীনতা কী তা অনেকেই বোঝে না। প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মাধ্যমে আরোপিত শিকল ভেঙে বেড়িয়ে আসা। যখন আপনি আপনার রবের সাথে সম্পর্কে যুক্ত হয়ে যাবেন, জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে শিখবেন, মানুষের বানানো বিধান ছেড়ে আল্লাহর দেওয়া বিধান মানতে পারবেন, তখনই আপনি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমি হিজাব পরিধান করছি। অনেক আইন আমাকে মানতে হচ্ছে, আবার অনেক কিছু আমি করতেও পারছি না। তারপরও আমি স্বাধীন। কারণ আমি অন্য কারো তৈরি করা আইন মানছি না। বরং আমি এমন এক সত্তার দেওয়া আইন মেনে চলছি, যিনিই আমাকে তৈরি করেছেন, আমাকে শারীরিক কাঠামো ও মানসিক অনুভূতি দান করেছেন এবং কীভাবে আমার কল্যাণ হবে– তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।

একটা সময়ে আমি নিজেও ভাবতাম, ইসলাম হয়তো নারীদের আঁটকে রাখে, নানাভাবে দমন করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যদি আরোপিত সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামকে তার প্রকৃতরূপে অনুশীলন ও ধারন করা যায়, তাহলে ইসলামই হলো একমাত্র আদর্শ, একমাত্র দর্শন– যা নারীদের প্রকৃত সম্মান নিশ্চিত করে। যা নারীদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য লালন করার সুযোগ করে দেয়। রাসুল (সা.) কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আমরা কার যতন বেশি করবো? তিনি বলেছিলেন, তোমার মাকে, তোমার মাকে এবং তৃতীয়বারও মায়ের কথাই বলেছিলেন।' ইসলাম যেভাবে একজন নারীকে সম্মানিত করে, সুরক্ষা দেয়, সহযোগিতা করে তা নজিরবিহীন। আল্লাহ যেভাবে নারীদেরকে কালামে পাকে সম্মানিত করেছেন এবং রাসুল (সা.) তার গোটা জীবন জুড়ে যেভাবে আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলাম নারীদেরকে কোনো সাধারণ মানুষ হিসেবে নয় বরং হিরকখণ্ড হিসেবেই বিবেচনা করেছে। আমি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করি, আমার জীবন যে নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল, আমাকে যদি আল্লাহ পাক হেদায়াত না করতেন তাহলে এতদিনে আমি হয়তো হারিয়েই যেতাম। আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছি বলেই নিজেকে সার্থক মনে করি, জীবনকে পরিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করি। কারণ, ইসলাম শুধু নারীকে স্বাধীনতাই দেয়নি, সম্মানিতও করেছে।

যারা এখনো ইসলামের ছায়াতলে আসার সুযোগ পাননি, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, এই যে আপনার প্রতিদিনের ব্যস্ততা, এত এত কাজকর্ম, সারাদিন এত ছুটোছুটি– একেই যদি আপনি জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন তাহলে আপনার জীবনের পরিণতি হবে বড়োই মর্মান্তিক। এগুলো স্রেফ বেঁচে থাকা। এটি কখনোই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠতে পারে না। কারণ জীবন হলো রোলার কোস্টারের মতো। এখানে দুঃখ আছে, সুখ আছে। উত্থান আছে, পতন আছে। জটিলতা আছে, বৈষম্য আছে। কষ্ট আছে, হতাশা আছে। জুলুম আছে, অনাচার আছে। এত সবকিছুর মধ্যেই যদি আমরা থেকে নিজেদের পরিপূর্ণ মনে করি, তাহলে নিজেদেরই বরং প্রশ্ন করা উচিত– কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো, আপনারা একটু ঠান্ডা মাথায় জীবনচক্র নিয়ে ভাবুন।

বেশি কিছু নয়। একটি ফুল নিয়েই কয়েক মিনিট ভাবুন। একটি সামান্য বীজ থেকে কীভাবে একটি ফুল ফোটে তা নিয়ে চিন্তা করুন। কিছু সময় পর আবার এ ফুলটিই কেন ঝরে যায়? আমি তাদেরকে সাগরের সামনে গিয়ে ভাবতে বলবো। কী বিশাল সাগর। কতটা গভীর এ সাগর। সাগরের নীচে কী ভীষণ অন্ধকার। অথচ সেই অন্ধকারের ভেতর আবার কত কত জীবনের বসবাস। অথবা গাছের একটি পাতা হাতে নিন। পাতার ওপর দিয়ে করা নকশা নিয়ে ভাবুন। কে এই পাতাকে এত সুন্দর নকশায় তৈরি করলো? এত সুন্দর একটি পাতা কীভাবে তৈরি হলো? যদি ফুল আসা যাওয়ার পেছনে আপনি কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য খুঁজে পান, সাগরের বয়ে চলার মাঝে যদি কোনো উদ্দেশ্য ধরা পড়ে কিংবা গাছের পাতার আবির্ভাবের নেপথ্যে আপনি যদি কারণ খুঁজে পান, তাহলে এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি মানুষের মতো এতটা বুদ্ধিমান একটি জীব হিসেবে এত সুন্দর শারীরিক কাঠামো নিয়ে কেন এ পৃথিবীতে এলেন? আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী? আপনি আবার কোথায় ফিরে যাবেন?
একটু ভাবুন, একটু চিন্তা করুন।

লেখক: সিইও, সোলেস ইউকে।
অনুবাদ : আলী আহমদ মাবরুর।

আমি দুটি বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছি

মারাম ফারাজ

আমি দুটি বাড়ি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছি। এখন আমি তৃতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি।

আমি নিজেকে বলেছিলাম যে একটি বাড়ির ক্ষতি প্রিয় মানুষদের হারানোর সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু আমি মিথ্যা বলছিলাম।

আমি আমার ছোট ভাগ্নির হাত ধরেছিলাম এবং আমরা দৌড়ে গেলাম, মধ্যরাতে আমাদের বিল্ডিং খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। যুদ্ধবিমানগুলি আমাদের মাথার উপর ঘোরাফেরা করছে, শিশুরা চিৎকার করছে এবং মাটি কাঁপছে যেন একটা প্র-লয়ংকারী ভূমিকম্প তার ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী একজন ইসরায়েলি দখলদার কর্মকর্তার কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিলেন, তাকে আমাদের সহ ভবনের বাকি বাসিন্দাদের সাথে তার বাড়ি খালি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পালানোর আগে, আমি আমার ঘরের দিকে একবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে শেষ বারের মতো তাকালাম, মনে পড়ল যে কয়েক বছর আগে আমি কীভাবে এটিকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছিলাম।

১৭ এপ্রিল, ২০২১-এ, আমার অন্য বাড়ি, যেটিতে আমি জন্মেছি-লাম, এমনই এক যুদ্ধ গোলার আঘাতে পুড়ে যায়। ইসরাইলের সেনারা যেন আমাদের নিয়ে আতশবাজি খেলছিল, এবং আমার জানালা দিয়ে স্ফুলিঙ্গ উড়ছিল। আমাদের জায়গার ৬৫% এরও বেশি পুড়ে গেছে, এবং আমার ঘর ছাই হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করতে আমাদের দেড় বছর লেগেছে। আমি কখনই ভাবিনি যে আমরা এটি আবার হারাবো, দুই বছরেরও কম সময় পরে!

আমরা এক ঘন্টার জন্য রাস্তায় স্থির ছিলাম, কোথায় যেতে হবে তা নিশ্চিত ছিলো না এবং আমাদের প্রিয় বাড়িটি পুরোপুরি ছেড়ে যেতে পারিনি। যুদ্ধবিমানগুলো আমাদের মাথার উপর দিয়ে ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছে, আর আমি ছোট বাচ্চাদের কান ঢেকে রাখতে বলেছি। একদিকে আমি আমার জামাকাপড় ভিজিয়েছিলাম অন্যদিকে মৃত্যুর ভয়ে কাঁপছিলাম। রাস্তায় সবাই একে অপরের দিকে এমন-ভাবে তাকালো যেন শেষবারের মতো হবে কিন্তু পরদিন প্রভাতে সূর্য ওঠে,আল্লাহ বাঁচিয়েচিলেন বলে তেমন ক্ষতি হয়নি সেদিন। "আমি আমার বাড়িতে যাচ্ছি। যদি তারা আমাকে বোমা মারতে চায়, অন্তত আমি বাড়িতে থাকব," আমার মা বলেছিলেন।

মাত্র তিন ঘণ্টা পর, প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে আমরা জেগে উঠি। একই সময়ে, আমাদের সমস্ত ফোনে (আমার, আমার মায়ের, বাবার এবং ভাইয়ের অনেক কল এসেছে, "হে গাজার বাসিন্দারা, আপনাদের সকলকে অবশ্যই আপনার এলাকা খালি করতে হবে কারণ এটি হামাস সন্ত্রাসীদের জন্য একটি অঞ্চল।চ আশেপাশে আমরা যাদেরকে চিনি তারা সবাই বেসামরিক, তাই আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম এটি আমাদের ভয় দেখানোর জন্য একটি হুমকি। কিন্তু আমার ভাই চেক করেছেন এবং আমাদের এলাকার সবাই একই নোটিশ পেয়েছেন। আমরা তখন নিশ্চিত ছিলাম যে আমাদের অবিলম্বে সরে যেতে হবে। এটা ভয়ঙ্কর ছিল!

আমরা আমার মামার পরিবারকে ডেকেছিলাম এবং সৌভাগ্যবশত, তারা আমাদের তাদের বাড়িতে স্বাগত জানায়।

আমরা যতটা সম্ভব আমাদের জিনিসপত্র জড়ো করে একটা গাড়ি ডাকলাম আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদিকে আমাদের চারপাশে তীব্রভাবে বোমাবর্ষণ চলতে থাকে। গাড়িটি আসার পর, আমরা আমার মামাকে আবার ফোন করি এবং জানতে পারি যে গোলার আঘাতে আমার মায়ের পাঁচজন কাজিন নিহত হয়েছেন যখন তারা বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন - তার থেকে মাত্র তিনটি বাড়ি দূরে - বোমা হামলা হয়েছিল। আমরা ভয়ে একটু ইতস্তত করলাম,

কিন্তু মামা বললেন, "না, এসো! তারপরও আমরা মরে গেলেও একসাথে মরবো এবং আমাদের কেউই অন্যের জন্য শোক করবে না।" আমরা সবাই গাড়িতে উঠলাম, কিন্তু বাবার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। যত তাড়াতাড়ি আমরা পেরেছি অবশেষে সরানো শুরু করলাম।ঠিক সামনে একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হয়. আমরা যদি এই দুই মিনিট দেরি না করতাম, তাহলে আমরা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

দ্বিতীয় ঁবাড়িচ যাওয়ার পথে

রাস্তায়, আমরা নিরাপদ গমনের জন্য প্রার্থনা করতে থাকলাম। আমরা ভয় পেয়েছিলাম, কাঁদছিলাম এবং কুরআন পড়ছিলাম, যতক্ষণ না আমরা আমার মামার বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে, আমরা তার পুরো পরিবারকে নিচতলায় জড়ো হতে দেখেছি, সবাই ভয়ে বকবক করছে। তারা কীভাবে আমার মায়ের কাজিনদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল তার গল্প শেয়ার করেছিল।

আমরা পরের দিন কি হবে তা নিয়ে চিন্তায় কাটিয়েছি। আমরা কি বোমা হামলার শিকার হতে যাচ্ছিলাম? আমরা কি পরবর্তী শিকার হবো? এবং যদি তাই হয়, আমাদের দেহ কি সনাক্ত করা যাবে, নাকি কয়েকটি অবশিষ্টাংশ থেকে অনুমানে চিহ্নিত করা হবে? আমি একটি ইন্টারনেট সংকেত পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছি যাতে আমি বিদেশে থাকা আমার বন্ধু এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। অবশেষে যখন আমি অনলাইনে যুক্ত হলাম, তখন হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ দেখলাম। ঁমাহমুদ আল নাওককে তার পুরো পরিবারের সাথে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের সেনারা হত্যা করেছে।চ আমার মনে হলো আমার বুকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। আমি এটি সঠিকভাবে পড়ছি তা নিশ্চিত করতে আমি আমার স্ক্রীন প্রায় ১০ বার রিফ্রেশ করেছি। মাহমুদ নিহত? কোনভাবেই না! সদ্য স্বপ্নের মালয়েশিয়া সফর থেকে ফিরেছেন তিনি! আমি হ্যালুসিনেশন করছি না তা নিশ্চিত করার জন্য আমি যতটা সম্ভব লোককে ফোন করেছি। হয়তো আমি সিজোফ্রেনিয়ার উপসর্গ অনুভব করছিলাম এবং জিনিসগুলো দেখছিলাম। কিন্তু এটাই সত্য ছিল। মাহমুদ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েলের শিকারের ক্রমবর্ধমান তালিকায় যোগ দিয়েছিলেন। না, আমি ভুল বানান করিনি। মাহমুদ আমাকে ছোট হাতের ঁরচ দিয়ে ইসরায়েল বানান করতে শিখিয়েছেন কারণ এটি একটি অবৈধ দেশ।

মাহমুদ আল নাওক ছিলেন আমার পরিচিত সবচেয়ে আবেগপ্রবণ, প্রেমময়, পছন্দের মানুষদের একজন। আমি তার সাথে দেখা করেছি তার হোয়াটস এপ্ নাম্বার এর মাধ্যমে, যেখানে আমরা দুজনেই সেই সময়ে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছিলাম। আমরা পরিচিতি হিসাবে শুরু করেছিলাম এবং ধীরে ধীরে বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম কারণ আমরা একসাথে আরও প্রকল্প করেছি, যদিও সে মহিলা সহকর্মীদের সাথে কিছুটা ভীতু ছিল। সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ছিলেন , কিন্তু অনেক দিক দিয়ে ৫০ বছরের বড়। সে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি ভয় পেয়েছিলাম, আমি কখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপের কোথাও আমার পড়াশোনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব না। সে আমাকে বলেছিলো যে আমি যদি এটি করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে ভাবতে থাকি তবে আমার ভয় বাস্তবে পরিণত হবে। তবে আমি যদি কিছু বিশ্বাস করি তবে তা সত্য হবে।

তবুও সে আমার ভয় শেয়ার করেছে। একদিন, সে স্বীকার করেছিলো যে তার বড় ভাই আহমেদ যুক্তরাজ্যের মতো বিদেশে তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে না পারলে তিনি কতটা বিষণ্ন হবেন। ২০১৪ সালের যুদ্ধে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর কাছে ক্যান্সারে আক্রান্ত তার মা এবং তার বড় ভাইকে হারানোর পর সে গাজা উপত্যকা ছেড়ে যেতে মরিয়া হয়েছিলো। আমি তাকে তার নিজের পরামর্শের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, এবং আমরা তাকে যে পদক্ষেপগুলি নিতে হবে তা ম্যাপ করে দিয়েছিলাম। একই সঙ্গে সে বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। "মারাম, আমি আমার পরিবার ছেড়ে যেতে পারবো না। তারাই আমার কাছে একমাত্র ভালোবাসার জিনিস,চ সে বললো।

অবশেষে অস্ট্রেলিয়ায় তার মাস্টার্স করার জন্য স্কলারশিপ অর্জন করলে সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো এবং তারপর ইসরাইল তাকে এবং তার স্বপ্ন উভয়কেই হত্যা করেছিলো।

সেই দিন পরে, আমি আমার মামার বসার ঘরে একটি সোফায় বসে ছিলাম, এটি বাড়ির ঁনিরাপদচ অংশ কারণ এটি গাজা সীমান্ত থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে। আমি দুঃখ এবং ভয় থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য একটি এলোমেলো বই পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, যতক্ষণ না আমি জেগে উঠি একটা চিৎকারের শব্দে এবং অনুভব করি আমার পিঠে ছুরিকাঘাতের ব্যথা। পাশের দরজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কাঁচের স্প্লিন্টার ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে ! আমার ক্ষত গুরুতর ছিলো না, কিন্তু আমি আমার চেয়েও এখন ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে থাকা লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারিনি।

সেই রাতেই মনে হলো আমার হৃদয়ে বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে আমি কিভাবে মারা যাবো? আমি কি ব্যথা পাবো? আমি কি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকে থাকবো এবং ক্যামেরায় ধরা পড়বো, আমার জাতির টেলিভিশনে দেখানো গণহত্যার অংশ হবো? কোরআনের কিছু আয়াত পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।পাখির কিচিরমিচির শব্দে ঘুম থেকে উঠে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি তখনো বেঁচে ছিলাম! আমি এখনও তবে এখানে আছি !

হঠাৎ আমার ফোন বেজে উঠল।

"অবশেষে মারাম,তুমি উত্তর দিলে ! আমি তোমাকে কল করার চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রতিবার লাইন ড্রপ! তুমি কোথায়? তুমি কি নিরাপদ? তুমি কি জানো কি ঘটেছিল?চ আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো। সে আমার পাড়ার ছিলো। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম আমরা ঠিক আছি। কিন্তু ঁতুমি কি জানো কি হয়েছে?চ দ্বারা সে কি বোঝাতে চেয়েছিলো?

ঁপ্রতিবেশী এইচ-এইচ-এ বোমা হামলা করা হয়েছে।চ

"কিন্তু টাওয়ারগুলি কি এখনও দাঁড়িয়ে আছে?চ (আমরা দুটি যমজ ভবনে থাকতাম)
"হ্যাঁ, তারা, কিন্তু ..
"তাহলে ঠিক আছে; অন্তত আমাদের টাওয়ারগুলো নিরাপদ।
"কিন্তু, মারামৃতোমার বাড়িপুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত...চ আমি ফোনটি কেটে দিলাম এবং শোনামাত্র জ্ঞান হারিয়ে দেয়ালে হেলান দিলাম।আমার অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিলো, মনে হচ্ছে যে আমার হৃদয় বুক থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি আমাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরলেন। "এটা ঠিক আছে, আমার প্রিয়. ঠিক আছে.চ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি ইতিমধ্যেই খবরটি জানতে পেরেছেন। আমার পরিবারেরও সবাই জানতো কিন্তু তারা আমাকে জানায়নি। আমরা আমাদের প্রিয় বাড়িটিকে এভাবে দ্বিতীয়বার হারিয়েছি। এটি শুধুমাত্র একটি ঘর ছিলো না। এটি ছিলো একটি আশ্রয়, আকাঙ্ক্ষা ও বিকাশের জায়গা, আশার লালনকারী!

আমি নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম এটা বলে যে একটি বাড়ির ক্ষতি প্রিয় মানুষদের হারানোর সাথে তুলনীয় নয়।কিন্তু আমি মিথ্যা বলছিলাম। আমার কাছে আমার বাড়িটা ছিল প্রিয় মানুষের মতো! এখানেই আমি আমার হতাশা এবং রাগকে কবর দিয়েছিলাম। যেখানে আমি এখন সেই নারী হয়েছি। আমি দেয়ালগুলি গোলাপী এবং বেগুনি রং দিয়ে এঁকেছিলাম এবং নানা পোস্টার দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। আমি আমার সতেজ দিনগুলিতে আরামের জন্য শিল্পকর্ম দিয়ে আমার বিছানা স্তূপ করে রেখেছিলাম।আমি যদি পালানোর সময় আমাদের ফটো অ্যালবামগুলি নেওয়ার কথা ভাবতাম, যাতে আমরা মনে রাখতে পারি যে এটি খুশি হওয়া কেমন ছিল। এখন মনে হয় যেন আমরা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছি। এটা মনে রাখা খুব দুঃখজনক।

তৃতীয় স্থানচ্যুতি
মামার বাড়িতে আমাদের স্থির বোধ করার সুযোগ হয়নি। ইসরায়েল এর পিছনে পুরো স্কোয়ারে বোমা মেরেছে এবং চার দিন পরে, নিষ্ঠুর সৈন্যরা আমাদের আবারও চলে যেতে এবং পালাতে দুই ঘন্টা হাঁটতে বাধ্য করে। জীবনের জন্য পালানোর সময়, আমরা মানুষের দেহাবশেষ দেখেছি, তাদের রক্ত রাস্তায় ঢেকে আছে। আবারও গৃহহীন, আবারও আশ্রয়হীন। আমরা আমার ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে রওনা হলাম, যেখানে আমরা আশ্রয় নিচ্ছি যতক্ষণ না আমাদের আরও একবার দৌড়াতে হবে।
আমরা সবাই ইসরায়েলের হাতে নিহত হবো। এটাই এখন চরম বাস্তবতা। আমি সারাক্ষণ এটাই অনুভব করি। আমি এ পর্যন্ত আমার চার বন্ধুকে হারিয়েছি, আমার বাড়ি এবং আমার জন্মভূমি সহ। আমাদের খাদ্য ও পানির চরম অভাব। ঘুমাতে গেলে খিদে পায়। বোমা পড়ছে এই ভয়ে আমাকে অনেকবার পালাতে হয়েছে। আমার কাছে জামাকাপড় বা মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও নেই! আমার শরীর ঢেকে রাখার জন্য আমাকে আমার কাজিনের কাছ থেকে পোশাক "ধারচ করতে হবে !

আমি রাগান্বিত, হতাশ এবং আমার লোকদের হত্যা ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার দৃশ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ভয় পাই। আমি আর কাউকে মানবতা, মূল্যবোধ এবং শান্তির কথা প্রচার করতে শুনতে চাই না। এখানে সময়ের প্রতিটি পল অনুপলে মানবতাকে হত্যা করা হচ্ছে। আমি এবং আমরা ফিলিস্তিনিরা কেবল কতিপয় সংখ্যা নই,আমি ও আমরা স্বপ্ন এবং অনুভূতির এক একজন মানুষ। আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন আমি একজন ইংরেজির অধ্যাপক বা মানবাধিকার কর্মী হব। আল্লাহ আমার সে স্বপ্ন পূর্ণ করুন।

আমি মারা গেলে দয়া করে আমাকে মনে রাখবেন। আমার নাম "মারাম"।
-একটি ইংরেজী সাময়িকী থেকে
অনুবাদ ও সম্পাদনা: জামান
অবরুদ্ধ গাজা, প্যালেস্টাইন ১১ নভেম্বর, ২০২৩

বিজ্ঞান ও কুরআনের মতে আকাশে ভাসমান উড়ন্ত গ্রহাণু কী পৃথিবীর সভ্যতার ধ্বংসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

আব্দুল মতিন

পৃথিবী একদিন না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, পৃথিবী তিনটি কারণে ধ্বংস হতে পারে–

১। বড়ো কোন গ্রহাণু বা পাথরের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

২। একদিন সূর্যের আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। যার ফলে পৃথিবীর মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের একটা অংশ আশঙ্কা করছেন যে, ধূমকেতুর আঘাতে পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

ইতালির আকাশ বিজ্ঞানী এঁরংবঢ়ঢ়ব চরধুধ আকাশে সর্বপ্রথম গ্রহাণু বা পাথর আবিষ্কার করেন। ঐ গ্রহাণুর ব্যাস ছিল ৬০০ কিলোমিটার। গ্রহাণু কোথায় আছে এর অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে এক ভাসমান পাথরের বেল্ট বা পাথরের ঝাঁক এবং শনির গ্রহের চতুর্দিকেও অনেক ভাসমান পাথর বা গ্রহাণু মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে। এদের যেকোনো একটি বা একাধিক যেকোন সময় পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের আওতায় চলে আস্তে পারে। আমেরিকার গ্রহাণু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, যেকোনো সময় বিনা নোটিশে এই গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত হেনে বর্তমান সভ্যতাকে মুহূর্তেই চিরতরে বিলীন করে দিতে পারে।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Tony Blair আকাশের গ্রহাণুগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনজন বিজ্ঞানী নিয়ে একটা বোর্ড তৈরি করে দেন। বিজ্ঞানীরা ৫০০০ গ্রহাণু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, ১ কি.মি. ব্যাস বিশিষ্ট একটি গ্রহাণু (যা হিরোসিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার চেয়ে ৫,৫০,০০০০০ গুণ বেশি শক্তি সম্পন্ন) যদি আটলান্টিক মহাসাগরে আছরে পড়ে তাহলে প্রায় ২৮ কি.মি. উচু প্লাবনের সৃষ্টি করে সমস্ত পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিবে। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে বড়ো মাপের পাথ রখণ্ড দ্বারা আঘাত হানার সম্ভাবনা বেশি। তার আলামত বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে পেয়েছেন।

১৯০৮ সালে ৩০ জুন ৬০ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি পাথর বা গ্রহাণু রাশিয়ার সাইবেরিয়ার গহীন জঙ্গলে আঘাত হেনেছিল। যা হিরোসিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার ৬০০ গুণ বেশি শক্তি সম্পন্ন ছিল। যার ফলে ৭৭০ বর্গ কি.মি. বন পুরোটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

২০১৩ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়ার ঈযবষুধনরহংশ শহরে গ্রহাণু আঘাত করে। ফলস্বরূপ এক তীব্র ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয় যা প্রায় ১২০০ মানুষকে আহত করে। পরে দেখা গেছে, এটি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছিলো তখন এর দৈর্ঘ্য ছিলো মাত্র ২০ মিটার।

বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় ৪০০০ গ্রহাণু বা পাথরখণ্ড যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণরত আছে এবং পৃথিবীকে আঘাত করার মানসিকতায় আদেশ লাভের প্রত্যাশায় দিন গুনছে।

গ্রহাণু বা পাথর সম্পর্কে কুরআন কী বলেছে

* সুরা আল-মুলক ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۭ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ

“তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশের অধিপতি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর পাথরের ঝাঁক প্রেরণ করবেন না? সেদিন তোমরা

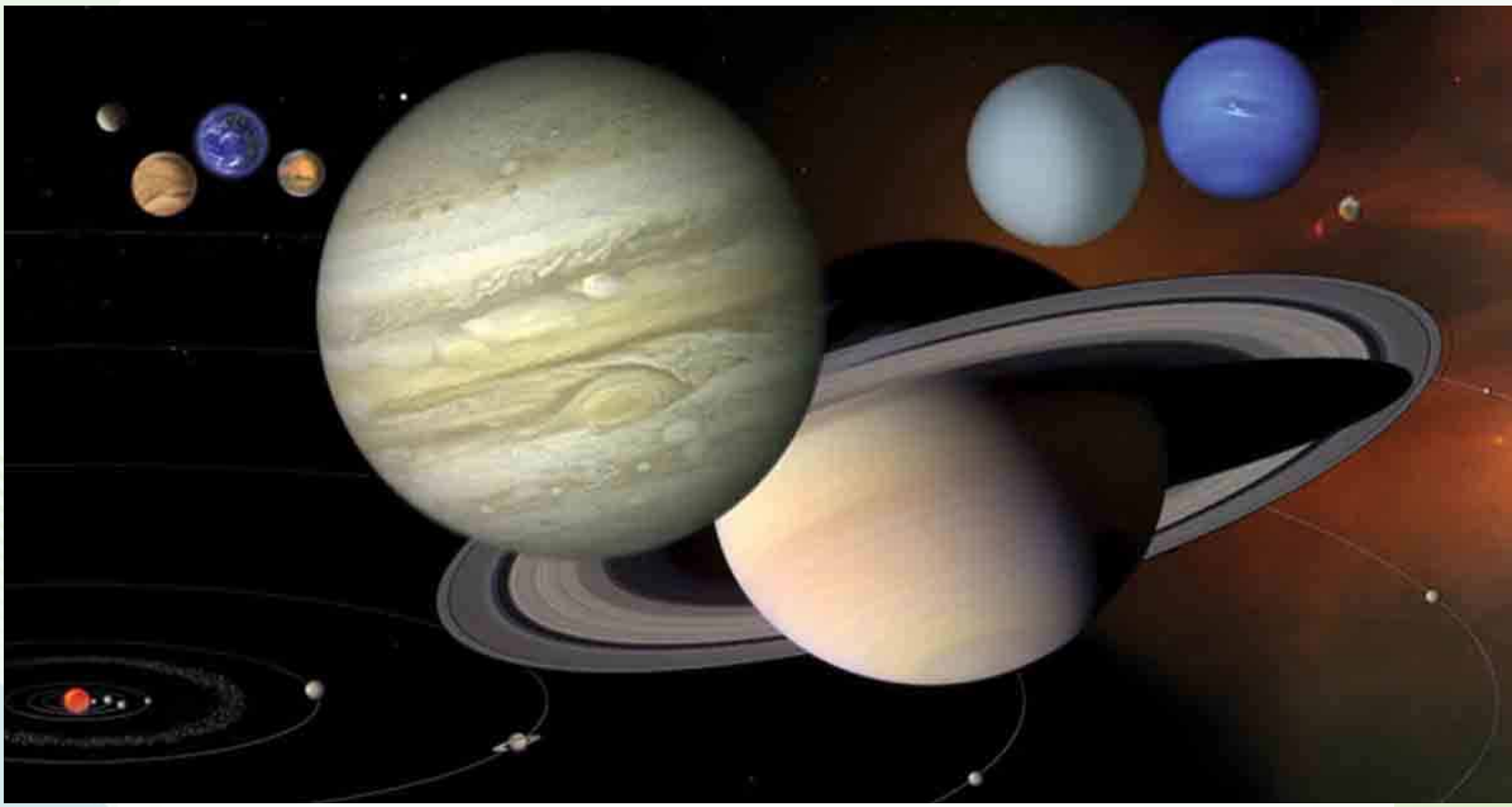

অবশ্যই জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ভয়াবহ ছিল।" (তাফসীর মুজিবুর রাহমান এবং তাইসিরুল)

সৌরজগতে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে পাথরের ঝাঁক বা পাথরের বেল্ট আছে। আবার কুরআনের বলা হয়েছে যে, মানুষের উপর পাথরের ঝাঁক আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কুরআনের বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

* সুরা আল ইনফিতার ৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

"যখন সমুদ্রকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে উত্তাল করে তোলা হবে।" (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন)

বিজ্ঞান বলছে, সমুদ্রে একটি বড়ো মাপের পাথরের আঘাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণসহ প্রায় ২৮ কি.মি. উচু প্লাবনের সৃষ্টি করে সমস্ত পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিবে। কুরআন বলছে, কেয়ামতের সময় আল্লাহ তা'য়ালা সমুদ্রকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে উত্তাল করে তোলা হবে। এক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

* সুরা আত-তাকভীর ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

"যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে।" (অনুবাদ অধ্যাপক গোলাম আযম)

যখন পারমাণবিক বোমার চেয়েও অনেক অনেক বেশি শক্তি সম্পন্ন পাথর সমুদ্রে আঘাত হানবে তখন সমুদ্রের পানিতে লেলিহান শিখাসহ আগুন জ্বলতে থাকবে। কুরআনের ভাষায় কেয়ামতের সময় সমুদ্রের পানিতে আগুন লেগে যাবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কুরআনের পারস্পরিক কত মিল এবং সাদৃশ্যতা। কোন বৈপরীত্য নেই।

আলহামদুলিল্লাহ। সর্বযুগে সর্বকালের চাহিদানুযায়ী সর্বোচ্চ জ্ঞানগত তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত উৎস আল কুরআন। আধুনিক বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই কুরআনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেনি। সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র আল কুরআনই সকল যুগের জড়বাদী মতবাদের মোকাবেলা করার পুরো সামর্থ্য রাখে। কারণ মহাবিশ্ব ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান ও কুরআনের বর্ণনা এক ও অভিন্ন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন যাতে সমাজের প্রকৃত জ্ঞানীগণ এক আল্লাহর সম্মুখে মাথা অবনত করেন। বিজ্ঞান ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়। ইনশাল্লাহ আগামী দিনে বিজ্ঞানই হবে এক আল্লাহর পক্ষে বিশ্বব্যাপী প্রচারক।

ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সংগঠন সংবাদ

ইউরোপে এমসিএ'র চলমান (সম্পৃক্ত/অধিভুক্ত) কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সূচনা:

ইউরোপে মুসলিমরা সংখ্যালঘু একটি জনগোষ্ঠী। ইউরোপের মোট জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা ৫ শতাংশের বেশি হবে না। তবে, ফ্রান্স ও সুইডেনের মতো কিছু দেশে মুসলিমদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। অন্যদিকে, এমসিএ'র ইউরোপ টিমটি মূলত ৬ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত যারা বিভিন্ন দেশে সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারক, প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা এবং সহায়তার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে দাওয়াতি কার্যক্রমের বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে আমরা এই দায়িত্বগুলো বণ্টন করেছি।

এই বাস্তবতায়, এমসিএ মেইনল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো অর্জনগুলো নিম্নরূপ:

পরিকল্পনা অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, নতুন কিছু দেশেও দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নেদারল্যান্ডস ও হাঙ্গেরিতে দাওয়াহ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২০০২ সালের মে মাসে পর্তুগালের দায়িত্বশীলের প্রস্থানের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশনার আলোকে সেখানে প্রাসঙ্গিক নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশে পরিচালিত সোয়াত এনালাইসিসের আলোকে সেখানকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।

যুবকদের মাঝে কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। যুবকদের কাজের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া আমাদের অগ্রাধিকার ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকগুলো দেশেই একাধিক ইউরোপীয়ান ভাষায় অনুবাদ ও নিত্য নতুন কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের মাঝে কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' বইটি ফরাসি ও ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদের জন্য পেশাদার সম্পাদক প্রয়োজন। একেএম নাজির আহমেদের 'ইসলামী সংগঠন' বইটিও ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। দুটো বই এবং একটি ব্রুশিয়ার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে; 'নবিজি (সা.) যা বলে গেছেন' অনূদিত হয়েছে ইতালি, অস্ট্রিয়া এবং সুইডেনে। তবে যুবকদের মাঝে কার্যক্রম পরিচালনায় আরও বেশ কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। যেমন : বই/বক্তার আদলে কিছু কাজ করা দরকার যেহেতু যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরেজি ও বাংলা ভাষা বুঝতে পারে না। ফিজিকাল প্রোগ্রাম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বক্তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যক্রম বিকশিত করার জন্য বিশেষ করে ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে যেকোনো রিসোর্স সহজলভ্য করার জন্য বোনদের ইসলামী সংগঠন

থেকেও সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন।

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াহ কার্যক্রম: ইউরোপের জনগণের মাঝে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া আমাদের পরিকল্পনায় ছিল। অমুসলিমদের মধ্যে কীভাবে দাওয়াতি কাজ করা যায় সেই ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। ইউরোপের জনসাধারণের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা থাকলেও অনেক দেশ এখনো এই কাজটি শুরু করতে পারেনি। তবে বেশ কিছু দেশে রাস্তায় বা সড়কে দাওয়াহ, সড়কের ওপর ইফতার এবং রাজপথে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মতো (সিসিলি) কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ইউরোপের অনেক দেশেই অনেকগুলো মসজিদ এবং সেন্টার রয়েছে। এই সেন্টারগুলো পরিদর্শনের জন্য অমুসলিমদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। অল্প কিছু দেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে কাজ করা সম্ভব হয়েছে যার মধ্যে ইতালি, অস্ট্রিয়া এবং সুইডেন অন্যতম।

টিম মেম্বারদের কয়েকজন সদস্যের সময় সংকুলান না হওয়ায় এবং ইউরোপীয়ান দেশগুলো সফরের খরচ অনেক বেশি হওয়ায় সঠিক সময়ে বেশ কিছু দেশেই সফর করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ইউরোপে থাকা আমাদের জনশক্তির মাঝে লিডারশিপ ক্যাপাসিটি (নেতৃত্বের সক্ষমতা) বৃদ্ধি এবং ইউরোপের বিদ্যমান বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য কয়েকটি দেশে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামেরও আয়োজন করা প্রয়োজন।

তারবিয়াহ প্রোগ্রাম বিশেষ করে সদস্য/সদস্যাদের জন্য টিসি এবং স্টাডি সার্কেলগুলো এমসিএ মেইনল্যান্ড থেকেই পরিচালনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সহযোগী/প্রাথমিক সদস্য/সদস্যাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোই আয়োজন করে যাচ্ছে।

নতুন করে আরো কিছু দেশে বিশেষ করে মাল্টা, রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ডসে দাওয়াহ কার্যক্রম বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। একইসাথে, বিভিন্ন দেশে দাওয়াহ কার্যক্রম বিকশিত করা এবং ইউরোপ জুড়ে বিদ্যমান ইসলামোফোবিয়া এবং ঘৃণ্য অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য সমমনা অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থার সাথে মিত্রতা স্থাপন করা হয়েছে।

ফজর চ্যালেঞ্জ- বার্মিংহাম

ফজর চ্যালেঞ্জ- মাইল এন্ড ইস্ট লন্ডন

Our Children Our Future Annual Event Organized By Muslim Community Association MCA- Harrow Road Jamme Mosque, West London Supported By Queen's Park Bangladesh Association Masjid Al Khalil New Vision Housing LTD

Muslim Community Association
Shoora Councill, Session 2023-2024

4th November 2023

Circular C01/2023-25/G1

My dear and respected brothers and sisters, Assalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuhu,

I hope and pray that this circular finds you in the best of health and highest spirit of Imaan. All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds. The Beneficent, the Merciful. Master of the Day of Judgment.

By the grace of Allah SWT and with His infinite mercy and endless blessings, we have started the new session 2023-2025 of our beloved organisation Muslim Community Association (MCA) with new vision and renewed commitment.

I am pleased to inform you that, following the CP and the Shoora Council Election on 8th October 2023 in the Annual General Meeting, we have successfully completed our 1st Shoora Council meeting on Saturday 21st October 2023 and 1st Management Council on 04th November 2023. In the Shoora Council the CP, in consultation with the Shoora Council, has appointed General Secretary (GS), Two Deputy General Secretary (DGS) and the Finance Director. We have already communicated this by the earlier circular sent on 23th October 2023. The Shoora Council has also approved CP's proposal of the motto and working principles A-F, and the departmental structure for the session, as stated below in this circular.

Alhamdulillah, according to the Articles of Association and Bye Laws, the Shoora Council has co-opted 12 Members (6 brothers and 6 sisters) in the Shoora Council in addition to 36 elected Shoora Members. In addition to the elected and co-opted members, the Shoora Council has also decided to invite two sisters and one brother in the Shoora Councils, as permanent invitees.

The newly elected Shoora Council has formed the Management Council (MC), comprised of CP and GS and 13 Shoora Council members elected by the Shoora Council, "to ensure the smooth running of the organisation".

The Central President, in consultation with the Management Council, has formed a 9 members Central Executive Committee (Exco) comprising of General Secretary (GS), Two Deputy General Secretaries (DGS) and Finance Secretary.

In consultation with the Management Council the Central President has also appointed required Departmental Directors, Teams for the session 2023-2025.

Following is the list of Shoora Council, Management Council, Executive Committee, Departments and Teams:

Muslim Community Association Session 2023-2025 Shoora Council				
Sl.No.	Name		Sl.No.	Name
1.	Abdud Dayyan Younus		25.	Nozmul Hussain
2.	Abdul Mumin		26.	Mahfuz Nahid
3.	Abul Hussain Khan		27.	Dr. Shireen Sobhani
4.	Anjumara Begum Beauty		28.	Afia Begum Shikdar
5.	Asma Khan		29.	Shirin Sultana
6.	Dilowar H. Khan		30.	Rahela Akhter Haque
7.	Dr. Dilder Chowdhury		31.	Khaleda Begum

Company Registration No. 13277798

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

8.	Dr. Mahera Ruby
9.	Fazlul Karim Shahjahan
10.	Hamid Hossain Azad
11.	Hasan Kausar Ahmed
12.	Hasan Sirajus Salekin
13.	Monowar Hossen
14.	Musaddiq Ahmed
15.	Mustaq Ahmed
16.	Nessar Ahmed
17.	Nurul Matin Chowdhury
18.	Rowshanara Kabir
19.	Sirajul Islam Hira
20.	Syed Tofael Hussain
21.	Mamoon Al-Azami
22.	Dr. Ashraf Mahmud
23.	Monjur Ahmed
24.	Farid Miah

32.	Muslimaat Nazema
33.	Amir Ali
34.	Anwar Ali Jeetu
35.	Asad Ahmed
36.	Azad Miah
37.	Ershad Ullah
38.	Hasanul Banna
39.	ImdadUllah Mahbub
40.	Kamal Uddin
41.	Muhammad Mustaquim
42.	Raju Shibly
43.	Razaul Karim Choudhury
44.	S. Badrul Alam
45.	Salah Uddin
46.	Sharifur Rahman
47.	Syed Jamirul Islam Babu
48.	Zahid Islam

Management Council	
1.	Hamid Hossain Azad
2.	Nurul Matin Chowdhury
3.	Dr Dilder Chowdhury
4.	Mamoon Al Azami
5.	Mustaq Ahmed
6.	Nessar Ahmed
7.	Abul Hussain Khan
8.	Hasan Kausar Ahmed

9.	Hasan Sirajus Salekin
10.	Abdul Mumin
11.	Dr Ashraf Mahmud
12.	Nozmul Hussain
13.	Syed Tofael Hussain
14.	Asma Khan
15.	Rowshanara Kabir

Central ExCo	
1.	Hamid Hossain Azad
2.	Nurul Matin Chowdhury
3.	Dr Dilder Chowdhury
4.	Musaddiq Ahmed
5.	Mustaq Ahmed

6.	Nessar Ahmed
7.	Dr Ashraf Mahmud
8.	Syed Tofael Hussain
9.	Rahela Choudhury
10.	Dilowar Hussain Khan- Ex- Office

Company Registration No. 13277798

Muslim Community Association
3rd Floor Business Wing LMC
38-44 Whitechapel Road
London E1 1JX UK
+44 (0)20 7377 5663
admin@mcaslte.org
www.mcaslte.org

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

Central Departments and Teams				
Sl. No.	**Departments**		**Directors**	
1.	Outreach and Awareness (Da'wah)	Community Dawah	Nessar Ahmed	
		New Area Development	Atiqur Rahman Zilu	
		Mainstream Dawah	Nozmul Hussain	
2.	Human Resources Management (Jamah)		GS to oversee	Monjur Ahmed
3.	Finance and Resources Management		Mustaq Ahmed	
4.	Education and Training (Tarbiyah)		Mamoon Al-Azami	
5.	Social Welfare (Birr)		FKM Shahjahan	
6.	Justice and Community Engagement		Mahfuz Nahid	
7.	Office Administration and Digital Transformation		Dr Ashraf Mahmud	
8.	Ulaama and Religious Leadership		Abul Hussain Khan	
9.	Research and publication		ADM Younus	
10.	Media & External Affairs		Syed Tofael Hussain	
11.	Culture		Monowar Hossen	
Central Teams				
1.	Policy and Strategy		Ayub Khan	
2.	Welfare BD		Syed Jamirul Islam Babu	
3.	Education and Training Centre		Musaddiq Ahmed	
4.	Internal Audit		Ayub Khan	
5.	Community Service Award		TBD	
6.	Muslim Voices		TBD	
7.	Sisters' Consultation		TBD	
Central Wings				
English Wing			Hasan Kausar Ahmed- President	
Mainland Affiliates			**Mainland Europe North-South:** Nazrul Islam **Mainland Europe East -West:** Sultan Ahmed **Overall In-charge to oversee the Mainland Europe:** Dr Dilder Chowdhury (DGS)	

Company Registration No. 13277798

Muslim Community Association
3rd Floor Business Wing LMC
38-44 Whitechapel Road
London E1 1JX UK

+44 (0)20 7377 5663

admin@mcaslte.org

www.mcaslte.org

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

Regional Presidents		
Sl.No.	Name	Region
1.	Raju Mohammed Shibly	London East
2.	Ershad Ullah	London North East
3.	Amir Ali	London North West
4.	Imdad Ullah Mahbub	London South West
5.	Azad Miah	London South East
6.	Salah Uddin	London West
7.	Hasanul Banna	MAPS
8.	Sharifur Rahman	East of England
9.	Muhammad Mustaquim	SWEIS
10.	Kamal Uddin	SEEMA
11.	Syed Jamirul Islam Babu	West Midland
12.	Razaul Karim Choudhury	East Midland
13.	Anwar Ali Jeetu	Yorkshire and the Humber
14.	Syed Badrul Alam	North West
15.	Zahid Islam	North East
16.	Asad Ahmed	Wales

Motto and working principles for the session 2023-2025, as approved by the Shoora Council:

- Motto: *Our MCA – A vehicle for Jannah*
  Ikhlas is our fuel – brotherhood is our driver
- *A-F of Working Principles:*
  Accountability
  Brotherhood
  Consolidation and Communication
  Dynamic Development
  Empowerment
  Family and Youth

May Allah forgive us all our sins, remove all our shortcomings, strengthen us with love and brotherhood and sisterhood for Him and bless us with abilities to discharge the responsibilities bestowed upon us for His cause, ameen.
Your brother in Islam,

Nurul Matin Chowdhury
General Secretary. Muslim Community Association (MCA)

Company Registration No.

Muslim Community Association
3rd Floor Business Wing LWC
38-44 Whitechapel Road
London E1 1JX UK

+44 (0)20 7377 5663 admin@mcaslte.org www.mcaslte.org

গাজায় হাসপাতালে ইসরাইলী বোমা বর্ষণের নিন্দা মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের

দ্য মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) গাজাস্থ আল আহলি ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালে ইসরাইলী বাহিনীর বোমা বর্ষণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। বোমা হামলায় শিশুসহ অন্তত ৫শ জন বেসামরিক ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন।

বিশ্বের যেসব মানবাধিকার সংগঠন গাজায় ইসরাইলের পূর্ণ অবরোধ ও নির্বিচারে বোমা হামলার মাধ্যমে চলমান মানবতা বিরোধী অপরাধের নিন্দা জানিয়েছে, এমসিএ তাদের সাথেও একাত্মতা পোষণ করছে।

এমসিএ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টা হামিদ হোসাইন আজাদ বলেন, 'দখলদার ইসরাইলী বাহিনী নগ্নভাবে প্রচলিত যুদ্ধনীতির অবজ্ঞা করছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথার স্পষ্ট লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। হাসপাতাল টার্গেট করা মূলত গণহত্যার মতোই একটি সন্ত্রাস এবং এটি একটি ঘৃণ্য পদক্ষেপ।'

তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে যেসব দেশ প্রকাশ্যে ইসরাইলকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের উচিত অবিলম্বে গাজায় চলমান সন্ত্রাস এবং নির্বিচারে শিশু ও বেসামরিক নাগরিক হত্যা বন্ধে ইসরাইলের প্রতি জোর দাবি জানানো। অন্যায্য অপরাধগুলোর জন্য ইসরাইলকে জবাবদিহির আওতায় আনার বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করে ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষকেরা কার্যত তাদের দ্বিমুখী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।'

অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর দাবি তোলার জন্য এবং একটি নিরাপদ করিডোর চালু করার মাধ্যমে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ঔষধ ও খাবার পৌঁছাবার সুযোগ দেওয়ার জন্য এমসিএ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

MCA calls for immediate ceasefire in Gaza

The Muslim Community Association (MCA) joins the international community in calling for an immediate ceasefire in Gaza, to allow vital supplies to the besieged people.

Hamid Hossain Azad, MCA Central President expressed his deep concerns on the catastrophic situation in Gaza, stating,

"We urge the international community to take urgent and meaningful action to force Israel to an immediate ceasefire. The inaction of world leaders is inexcusable."

Mr. Azad further added that the persecution of Palestinians in the West Bank and other parts of the occupied territories must be stopped immediately.

MCA also calls on the British government and all political parties to listen to the demands of the British public to stop the carnage being inflicted on the Palestinians in Gaza.

History and Current Reality

History and Current Reality
after the war
Palestine

History and Current Reality
Big Thanks to MCA

History and Current Reality
War on Gaza
2,700 missing people, including 1,500 children are still under the rubble of their houses!
198 medical staff were killed!
53 Ambulances were destroyed!
>52 mosques destroyed !

Ring road (S)
(A4, A3)
Westminster
Ring road (N)
(A40, A41)
The City
Kilburn A5
Notting Hill Gate
A402

Free Palestine
HANDS OFF AL-AQSA

SOLIDARITY
WITH
PALESTINE
MUSLIM
VOICES
mv

STOP
BOMBING
GAZA
CEASEFIRE
NOW!
MUSLIM
VOICES
mv

CEASEFIRE

MCA calls for immediate ceasefire in Gaza

JAMI MOSQUE
& ISLAMIC CENTRE
BIRMINGHAM
2023 Winter
CONFERENCE

JAMI MOSQUE
& ISLAMIC CENTRE
BIRMINGHAM
2023 Winter
CONFERENCE

2023 Winter

JAMI MOSQUE
& ISLAMIC CENTRE
BIRMINGHAM
2023 Winter
CONFERENCE

JAMI MOSQUE
& ISLAMIC CENTRE
BIRMINGHAM
2023 Winter
CONFERENCE

2023 Winter
CONFERENCE
JAMI MOSQUE

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশনের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রাম সমূহ।

MCA ULAMAA CONFERENCE

2nd round of winter clothes distribution by LER at Barking.

MCA youth LONDON SOUTH WEST committee setup programme

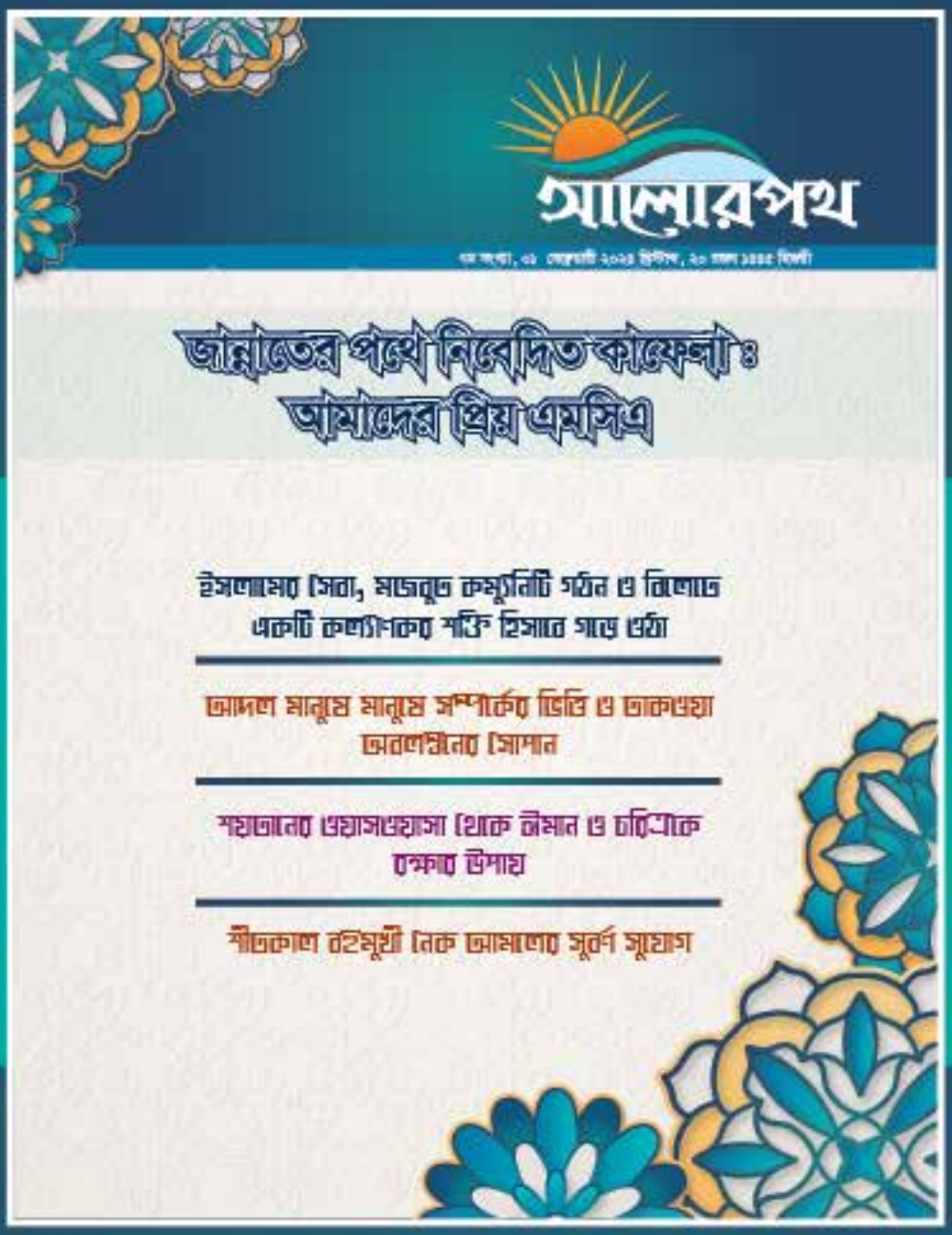
আলোরপথ
জান্নাতের পথে নিবেদিত কাফেলা ঃ
আমাদের প্রিয় এমসিএ
ইসলামের সেবা, মজবুত কম্যুনিটি গঠন ও বিশ্বে
একটি কল্যাণকর শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা
আদর্শ মানুষ মানুষ সম্পর্কের ভিত্তি ও তাকওয়া
ভিত্তিক সমাজ
শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ঈমান ও চরিত্রকে
রক্ষার উপায়
শীতকাল বহুমুখী নেক আমলের সুবর্ণ সুযোগ